হীরক জয়ন্তী বর্ষ
(১৯৬৫-২০২৪)

মডার্ণ ক্লাব

নাগেরজলা, ভট্টপুকুর, আগরতলা

প্রতিবিম্ব

(বিশেষ সংখ্যা)

১৯৮৯ - ৯০ সালে ক্লাবের রজত জয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে মুখমন্ত্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার, মন্ত্রী সুরজিৎ দত্ত, ক্লাব সভাপতি মিহির চক্রবর্তী, ক্লাব সম্পাদক সজল চক্রবর্তীসহ অন্যান্যরা।

২০১৪-১৫ সালে ক্লাবের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপনের নানা রঙিন মুহূর্ত

সুবর্ণ জয়ন্তী মঞ্চে নৃত্যানুষ্ঠান

বক্তব্য রাখছেন সভাপতি সজল চক্রবর্তী

সঙ্গীত পরিবেশন করছেন বিশিষ্ট শিল্পী শিব প্রসাদ ধর

অনুষ্ঠান মঞ্চে জাদু প্রদর্শন

সঙ্গীত পরিবেশন করছেন মুম্বাইয়ের শিল্পী কৌশিক

২০১৫ সালের ক্লাবের কার্যকরী কমিটির নির্বাচিত সদস্যদের শপথবাক্য পাঠ করাচ্ছেন ক্লাব সভাপতি সজল চক্রবর্তী

সৃষ্টি থেকে আজ পর্যন্ত এক নজরে মডার্ণ ক্লাব

- উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় শেখর স্মৃতি নাটক প্রতিযোগিতায় ১ম শ্রেষ্ঠ ও তৃতীয় প্রযোজনার পুরস্কারসহ বহুবার পুরস্কৃত।
- আগরতলায় অনুষ্ঠিত মানস গাঙ্গুলী স্মৃতি নাটক প্রতিযোগিতায় বিশেষ পুরস্কার।
- ইন্দ্রনগরে অনুষ্ঠিত স্বপন স্মৃতি ফুটবল প্রতিযোগিতা, বিশালগড়ে অনুষ্ঠিত মহম্মদ স্মৃতি গোল্ড কাপ প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান দখল।
- ত্রিপুরায় অনুষ্ঠিত আন্তঃব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় ১ম ও ২য় স্থান দখল এবং দিল্লিতে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় উল্লেখযোগ্য স্থান দখল।
- ক্লাব পরিচালিত দুঃস্থ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অবৈতনিক সান্ধ্য কোচিং সেন্টার স্থাপন (বর্তমানে বন্ধ)।
- বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত হকি ও ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় একাধিকবার প্রথম স্থান ও দ্বিতীয় স্থান দখল।
- ক্লাব কর্তৃক দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের পুস্তক বিতরণ।
- এলাকার দুঃস্থ লোকদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে আর্থিক সাহায্য প্রদান।
- ক্লাব কর্তৃক একাধিকবার স্বাস্থ্য শিবির করা এবং স্বল্পমূল্যে হেপাটাইটিস-বি টিকা দান এবং ডায়াবেটিস রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ।
- কৃতী ছাত্র-ছাত্রী এবং বিশিষ্ট গুণীজনের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান এবং স্মারক প্রদান।
- কৃষি মেলায় পুষ্প প্রতিযোগিতায় ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান দখল।
- আরক্ষা দপ্তর ও বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক শারদোৎসবে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় বহুবার ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান দখল।
- ক্লাব কর্তৃক প্রতিনিয়ত বিভিন্ন খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা।
- ত্রিপুরা পাবলিশার্স গিল্ড কর্তৃক ক্লাবের শারদ স্মরণিকা 'প্রতিবিম্ব'র একাধিকবার প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান দখল।
- ক্লাবের উদ্যোগে রক্তদান শিবির সংগঠিত করা হয়েছে।
- পুরসভার সাহায্য নিয়ে ভিতরের পুকুরটিকে সংস্কার ও পাড় বাঁধানোর উদ্যোগ ক্লাবের এলাকার উন্নয়নে একটি বিরাট কাজ চলছে।
- ক্লাব পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান :-
- শিশুদের জন্য আর্ট স্কুল (আঁকা শেখো)
- শিশুদের জন্য গানের স্কুল (সংগীত কলামন্দির)
- শিশুদের জন্য নাচের স্কুল (নৃত্যাঙ্গন)।

সর্বোপরি প্রতি বছর ১০ থেকে ১৫ দিনব্যাপী বহুমুখী কর্মসূচি নিয়ে শিশু উৎসবের আয়োজন করে মডার্ণ ক্লাব।

Diamond Jubilee Year

(1965-2024)

MODERN CLUB

Nagerjala, Bhattapukur, Agartala,
Tripura West.

Magazine 'Pratibimba'
Special Issue -2024

'প্রতিবিম্ব' হীরক জয়ন্তী সংখ্যা

সম্পাদক :

পার্থ সারথি দেব

উপদেষ্টা :

শেখর সি দত্ত

....

হীরক জয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি

কনভেনার	:	সুবীর দত্ত
যুগ্ম কনভেনার	:	মৃণাল কান্তি দেবরায়
		হিমাদ্রী সাহা
		স্বপন কুমার দত্ত
কোষাধ্যক্ষ	:	রামকৃষ্ণ বণিক

সূচীপত্র..........

ক্লাবের স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাস — শেখর সি. দত্ত ◈ ১৪

ফিরে দেখা— শংকর কুমার ঘোষ ◈ ১৬

স্মৃতির পাতা থেকে — সঞ্জু দত্ত ◈ ১৮

কোথায় যে হারাল — দিলীপ দাস ◈ ২০

যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে — বিমলেন্দ্র চক্রবর্তী ◈ ২৩

উদাসীন সময়ের খোঁজে — ধূর্জটী কুমার সাহা ◈ ২৫

চল্‌টা যেন থাকে — প্রদীপ কুমার ভৌমিক ◈ ২৮

মানুষ — গৌরভ দত্ত ◈ ২৮

গর্বের ক্লাব — রাজেশ ভদ্র ◈ ২৮

স্মরণে দিলীপ দা — প্রণব পোদ্দার ◈ ২৯

আমার পাড়া সুন্দর পাড়া — সঞ্জয় দত্ত ◈ ৩০

প্রিয় মডার্ণ ক্লাব — রাজু ঘোষ ◈ ৩২

মডার্ণ ক্লাবের সেকাল ও একাল — প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত ◈ ৩৩

পুরুষ মাগে নারীর প্রণয়•••— নির্মল অধিকারী ◈ ৩৪

মহাজাগতিক সৃষ্টিতত্ত্বের রহস্য — সুব্রত সাহা ◈ ৩৬

DISASTERS & OUR THOUGHTS

- Santonu Saha ◈ ৩৮

A Penniless Billionaire - Gourav Datta ◈ ৩৯

Prof. (Dr.) Manik Saha

CHIEF MINISTER OF TRIPURA
AGARTALA - 799010

सत्यमेव जयते

শুভেচ্ছা

আগরতলার ভট্টপুকুরস্থিত মডার্ন ক্লাব এবছর হীরক জয়ন্তী পালন করছে।হীরক জয়ন্তী বর্ষ উদযাপনকে স্মরনীয় রাখতে ক্লাবের স্মরণিকা **'প্রতিবিম্ব'**-এর প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

হীরক জয়ন্তী বর্ষ পালন ক্লাবের জন্য নিশ্চয়ই গৌরবের বিষয়।প্রতিটি ক্লাব এলাকায় পারস্পরিক সৌহার্দ্য বজায় রাখা, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, রক্তদান এবং নেশার বিরুদ্ধে জন সচেতনতা গড়ে তোলাসহ সামাজিক কাজে ক্লাবসমূহের দায়বদ্ধতা রয়েছে ।

সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে মডার্ন ক্লাবের হীরক জয়ন্তী বর্ষ সফল হোক।

Msaha

(প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা)

Office: Room No. 1312, New Capital Complex, Agartala - 799010, Tripura
Phone: 0381-2414000, 2414003, 2414318, Fax: 2413201, e-mail: cmoffice-tr@gov.in

RAM PRASAD PAUL
DEPUTY SPEAKER

TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY
SECRETARIAT, AGARTALA (INDIA)

MESSAGE

I express my gratitude and congratulate to all the members of the Modern Club for publishing a Club annual magazine "PRATIBIMBA" on the occasion of "Diamond Jubilee "on 24th January, 2024.

I am happy to know that Modern Club is on its 60th years. Since it's established the members of the club are keeps doing many social works for the betterment of local and adjacent areas to makes peoples life smooth and safe.

On the occasion of "Diamond Jubilee" I would like to extend my appreciation and best wishes to the members of Modern club and continue doing good works for the society.

All the Best.

22/01/2024

(Ram Prasad Paul)

(RAM PRASAD PAUL)
Deputy Speaker
Tripura Legislative Assembly
Agartala, Tripura

Office: Deputy Speaker's Office, New Capital Complex, Agartala, West Tripura, PIN-799010
Tel: 0381-2414069(office), Cell: 9436120317, Fax: 0381- 2414095
E-mail: vidhansabha_tripura@rediffmail.com/ dyspeaker@gmail.com
Website: www.tripuraassembly.nic.in

Green Tripura Clean Tripura

AGARTALA MUNUCIPAL CORPORATION

AGARTALA, WEST TRIPURA

Phone : (0381) 2385149, 232 5507
Mobile : 9436120161
Fax : 0381-2385149
E-mail : amc.tripura@gmail.com

Dipak Majumder
MAYOR

MESSAGE

I am very glad to learn that **MODERN CLUB** is going to publish souvenir namely **PRATIBIMBA.**

A Magazine serves the organisation as its mouth piece by reporting its activities and achievements. It also publishes the contributions of its members. All these become fond memorabilia for everyone connected with the Organisation.

Besides, it also serves, very importantly, as the launching pad of the future writers and poets of repute.

I wish the magazine all success in all these activities appreciably well.

(**Dipak Majumder**)
Mayor
Agartala Municipal Corporation

Smt. Sampa Sarkar (Chowdhuri)
MEMBER
Agartala Municipal Corporation
Agartala, Tripura (W).

Mobile : 9862515774
Ward No. 40

শুভেচ্ছা বার্তা

মডার্ণ ক্লাব তাদের ষাট বছর বয়স উপলক্ষে হীরক জয়ন্তী উৎসব পালন করছে এবং 'প্রতিবিম্ব' মুখপত্র প্রকাশিত হচ্ছে জেনে খুব খুশী হয়েছি।

মডার্ণ ক্লাব রাজধানী শহরের একটি সুপরিচিত নাম। সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড এবং সামাজিক দায়িত্ব পালনে এই ক্লাবের অত্যন্ত সুনাম রয়েছে। আশা রাখবো আগামী দিনেও তাদের এলাকাবাসীদের প্রতি দায়বদ্ধতা অম্লান থাকবে, অনুকরনীয় হবে।

হীরকজয়ন্তী উৎসব সার্বিক দিক থেকে সফল হোক এবং 'প্রতিবিম্ব' সবার কাছে প্রশংসিত হোক শুভেচ্ছা রইলো।

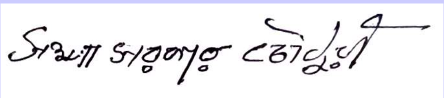

শ্রীমতি সম্পা সরকার চৌধুরী
কর্পোরেটর
৪০ নং ওয়ার্ড

ABHIJIT MOULICK

Chairman
South Zone, Agartala Municipal Corporation
Contact No. : 9436169379 / 8787692265
E-mail : abhijit.moulick@gmail.com

শুভেচ্ছা বার্তা

মডার্ণ ক্লব আমাদের শহর দক্ষিণাঞ্চলের স্বনামধন্য এবং একটি প্রাচীন ক্লাব। ক্লাবের হীরক জয়ন্তী উদ্‌যাপন মহোৎসব উপলক্ষ্যে ক্লাবের সকল কার্যকর্তাদের প্রতি রইল আমার অনেক অনেক শুভ কামনা।

এলাকার সামাজিক সংস্থা হিসাবে আপনারা ৬০ বছরের সফর পূর্ণ করেছেন। এই ছয় দশকে নিশ্চিতভাবেই অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছে, অনেক সাফল্যও এসেছে, সামাজিক কর্মকান্ডে আপনারা অনেকটা এগিয়ে, নিশ্চিতভাবেই ক্লাবকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবেন। আপনারা দক্ষতার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মনে একটি বিশ্বাস গড়ে তুলেছেন। সাধারণ মানুষের এমন ভরসা জয় করা কোনও সাধারণ সাফল্য নয়। এই ভাবমূর্তি ও আস্থা গড়ে তোলার জন্য বিগত ৬০ বছরে যাঁরা অবদান রেখেছেন, সংস্থার সকল কার্যকর্তারা শুভেচ্ছার দাবিদার।

আমাদের দেশ আগামী ২০৪৭ সালে স্বাধীনতার শতবর্ষ পালন করবে, আমাদের আদরণীয় প্রাধানমন্ত্রী মোদিজীর নেতৃত্বে ভারত এক উন্নত দেশ হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে এবং বিশ্বগুরুর আসন অলঙ্কৃত করবে।

আমার বিশ্বাস আপনারা সকলেই সমর্পিত এবং সংকল্পবদ্ধ হবেন, আর যখন দেশ ২০৪৭ সালে স্বাধীনতার শতবর্ষ পালন করবে, তখন এই দেশের আশা-প্রত্যাশার অনুরূপ আপনারা নিজেদের ক্লাবকে সেই উচ্চতায় পৌঁছে দেবেন।

যে সকল সদস্যরা এই ক্লাবের সাথে দীর্ঘদিন জড়িত ছিলেন, কর্মের মাধ্যমে বিভিন্ন ভূমিকা রেখে গেছেন তাঁদের সকলের প্রতি রইলো আমার প্রণাম এবং আমি ক্লাবের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করছি।

আবার সকলের প্রতি রইলো আমার শুভ কামনা ও শুভেচ্ছা।

নমস্কারান্তে—
অভিজিৎ মৌলিক
চেয়ারম্যান
সাউথ জোন,
আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

ক্লাব সভাপতির শুভেচ্ছা

মডার্ণ ক্লাবের শুভ হীরক জয়ন্তী বর্ষে আপনাদের সবার জন্য অনেক শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা রইলো। ক্লাবের রজত, সুবর্ণ ও হীরক — এই জয়ন্তীগুলির উদ্‌যাপনের সাথে শুধু নয়, গত ৪ দশকের বেশী সময় ধরে ক্লাবের সাথে সর্বক্ষণ ওতপ্রেতভাবে জড়িয়ে নিজেকে খুব গর্বিত বোধ হচ্ছে এবং ভালো লাগছে। মনে হয় নিজের জীবনের বাইরে একটা সুন্দর সমাজ আছে যেখানে অনেক অনেক আনন্দ আছে। এইভাবে ৪ দশক ধরে কখনও ক্লাব সম্পাদক, কখনও ক্লাব সভাপতি থাকার কারণে ক্লাবের ভালো হলো, নাকি অন্যকিছু হলো তা ক্লাব সদস্যরা ও এলাকাবাসী একমাত্র বলতে পারবেন। ভালো যা হয়েছে তা সবার সম্মিলিত চেষ্টায় হয়েছে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি। যা হওয়া উচিত ছিলো, অথচ হয়নি তা আমার ব্যর্থতা।

বর্তমান সময়ে এবং ভবিষ্যতের জন্য এলাকাবাসীকে নিয়ে নেশার বিরুদ্ধে লড়াই আমাদের অঙ্গিকার। প্রতিদিন যারা নেশাগ্রস্ত থাকে তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে নেশামুক্ত করা, এনিয়ে রাজ্য সরকারের সাথে হাত মিলিয়ে কাজ করা, বিশেষ করে নেশা কারবারীদের এই মারণ ব্যবসা থেকে বিরত করার জন্য সমস্ত উপায় ব্যবহার করতে হবে। পরিশেষে বলবো ক্লাব আপনার সাথে আছে। আপনারাও ক্লাবের সাথে থাকুন।

ধন্যবাদান্তে—

- সজল চক্রবর্তী

সভাপতি

মডার্ণ ক্লাব

হীরক জয়ন্তীতে
ক্লাব সম্পাদকের বার্তা

মডার্ণ ক্লাবের হীরক জয়ন্তী বর্ষে রাজ্যের প্রত্যেক সম্মানীয় নাগরিকদের প্রতি রইলো ক্লাবের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। ১৯৬৫ সালে কিছু উদ্যমি যুবকদের প্রচেষ্টায় সরস্বতী পূজার মাধ্যমে শুরু হয় মডার্ণ ক্লাবের পথচলা। গুটিগুটি পায়ে আজ ৬০তম বর্ষে পদার্পন। এই ৬০ বছরে মডার্ণ ক্লাব শুধু পূজা নিয়েই ব্যস্ত থাকেনি, মডার্ণ ক্লাব চেষ্টা করেছে সমাজের প্রতিটি মানুষের সেবায় নিয়োজিত থাকার। ক্লাবের উদ্যোগেই হয়েছে ভট্টপুকুর চৌমুহনী থেকে অরুন্ধতী স্কুল ও বাপুজি স্কুল পর্যন্ত রাস্তার সম্প্রসারন। মডার্ণ ক্লাব বিগত ৪৫ বছর ধরে করে আসছে ১৫ দিনব্যাপি বিভিন্ন বয়সের শিশু এবং পুরুষ ও মহিলাদের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। প্রতি বছর হয়ে থাকে রক্ত দান উৎসবের মতো মহৎ উৎসব, স্বাস্থ শিবির, বিভিন্ন ধরনের রক্ত পরীক্ষা, দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ, দুঃস্থ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের আর্থিক সাহায্য প্রদান এবং বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ড। ক্লাব ও এলাকাবাসীর সাথে অবশ্যই সরকারের প্রচেষ্টায় আজ মধ্য পুকুরের সংস্কার ও চারদিকের পাড় বাঁধানোর কাজ চলছে। আমি ধন্যবাদ জানাই ক্লাবের প্রতিটি সদস্য ও এলাকার প্রত্যেক নাগরিকদের যারা আমাকে সম্পাদকের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিয়েছেন। এই দায়িত্বে নিজেকে গর্বিত বোধ করছি। বিশেষ করে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সেই সকল উদ্যমী যুবকদের যারা ১৯৬৫ সালে ক্লাবের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আজ তারা প্রবীন, তাদের জানাই সশ্রদ্ধ প্রণাম।

- সঞ্জিত নাহা
সম্পাদক
মডার্ণ ক্লাব

হীরক জয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপন - ২০২৪

সভার্ণ ক্লাব

নাগেরজলা, ভট্টপুকুর, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা।

সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি

২৪ জানুয়ারি ২০২৪ :
- হীরক জয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন। এলাকার প্রবীণ নাগরিক, রাজ্যের বরিষ্ঠ সাংবাদিক ও শহর দক্ষিণাঞ্চলের ক্রীড়া ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা ক্লাবগুলোকে সংবর্ধনা। হীরক জয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ক্লাবের স্মরণিকা 'প্রতিবিম্ব'-র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ।

২৫ জানুয়ারি ২০২৪ :
- সকাল ৬ টায় ক্রসকান্ট্রি (পুরুষ ও মহিলা) দৌড়।
- বিকাল ৪টায় একাঙ্ক নাটক (১৪ বছর পর্যন্ত)।

২৬ জানুয়ারি ২০২৪ :
- সকাল ৮টায় জাতীয় পতাকা ও ক্লাব পতাকা উত্তোলন।
- সকাল ৮.৩০ মিনিটে সব গ্রুপের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা।
- সকাল ১০টা থেকে দাবা প্রতিযোগিতা।
- সকাল ১১টায় যোগা প্রতিযোগিতা (সব গ্রুপের ছেলে ও মেয়ে)।
- বিকাল ৪টায় রবীন্দ্র সংগীত।

২৭ জানুয়ারি ২০২৪ :
- বিকাল ৪টায় নজরুল সংগীত। স্বাস্থ্য শিবির, আধার আপগ্রডেশন ও বিবাহ নিবন্ধীকরণ ক্যাম্প।

২৮ জানুয়ারি ২০২৪ :
- সকাল ৯টায় রক্তদান শিবির। শিশুরোগ, নাক-কান-গলা, মেডিসিন, চর্মরোগ, চক্ষু ও স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের নিয়ে স্বাস্থ্য শিবির। বিনামূল্যে বিভিন্ন রক্ত পরীক্ষা।
- দুপুর ১২টায় ক্যুইজের বাছাই পর্ব। ২ টায় ক্যুইজের ফাইন্যাল প্রতিযোগিতা।
- দুপুর ১টায় ক্যারাম প্রতিযোগিতা ফাইন্যাল।
- বিকাল ৪টায় লোকগীতি।

২৯ জানুয়ারি ২০২৪ :
- বিকাল ৪টায় সব বিভাগের নজরুল নৃত্য।

৩০ জানুয়ারি ২০২৪ :
- বিকাল ৪টায় সব বিভাগের লোকনৃত্য।

৩১ জানুয়ারি ২০২৪ :
- বিকাল ৪টায় সব বিভাগের আবৃত্তি (রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্ত)

১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ :
- বিকাল ৪টায় সব বিভাগের রবীন্দ্র নৃত্য।

২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ :
- দুপুর ২টায় বল নিক্ষেপ।
- বিকাল ৪টায় যেমন খুশী সাজো।
- মহিলাদের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা।

৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ :
- পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান।

অনন্য গৌরবের অধিকারী

সম্পাদকীয়

কতোই না স্মৃতি হৃদয়জুড়ে। ষাটটি বছর তো আর কম নয়। ক্লাব প্রতিষ্ঠার সময় জন্মই হয়নি আমার। ফলে যখন থেকে 'হাঁটি-হাঁটি-পা-পা' তখন থেকেই চোখের সামনে মডার্ণ ক্লাব। অনেক কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে কাজ করতে করতে আজ মডার্ণ ক্লাব হয়ে উঠেছে এলাকার মানুষের আপনজন। এখন পাড়ার মানুষের সুখে, দুঃখের নিত্যসঙ্গী মডার্ণ ক্লাব।

আক্ষরিকভাবে বলতে গেলে পাড়ার একটি ক্লাবের ক্ষমতাই বা কতটুকু। কিন্তু যদি থাকে পরোপকারের বাসনা, মনে থাকে সমাজেসবার আকুতি, অনিয়মকে ভাঙার জেদ — তাহলে ক্ষুদ্র চারাগাছও মহিরূহ হয়ে উঠতে পারে। তার জ্বলন্ত নিদর্শন আমাদের প্রিয় এই ক্লাব। এলাকার উন্নয়নে সৃষ্টি লগ্ন থেকে নিরলস প্রচেষ্টা জারি রেখেছন ক্লাবের তরুণ, যুব ও প্রবীণরা। তাই সমস্যা যতোই আসুক, এলাকাবাসীর স্বার্থে লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে কিন্তু মডার্ণ ক্লাবই।

ক্লাবের ষাট বছরে পা দেয়ার আনন্দ তাই এলাকার ঘরে ঘরে। এই আনন্দঘন মুহূর্তে আবেগপ্রবণ হয়ে উঠেছেন ক্লাব প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের সাথে প্রবীণ, নবীন সবাই। স্বাভাবিকভাবেই সাড়ম্বরেই পালিত হবে ক্লাবের ষাট বছর উদ্‌যাপন। ক্লাব কর্তৃপক্ষ হীরক জয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপনকে কেন্দ্র করে ১২ দিনব্যাপী নানা অনুষ্ঠান হাতে নিয়েছেন। এরই অঙ্গ হিসাবে প্রকাশিত হলো ক্লাবের বাৎসরিক স্মরণিকা 'প্রতিবিম্ব' এর বিশেষ সংখ্যা। হীরক জয়ন্তী বর্ষে 'প্রতিবিম্ব' এর বিশেষ সংখ্যার রন্ধ্রে রন্ধ্রে রয়েছে ক্লাবের স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাসের গল্প। কোথা থেকে আজ কোথায় এসেছে মডার্ণ ক্লাব তা উঠে এসেছে এলাকার অভিজ্ঞদের কলমে।

এই দীর্ঘ পথচলায় আমরা হারিয়েছি ক্লাবের সক্রিয় অনেক সদস্যকে। ক্লাব পরিচালনায় তাদের অভাব চিরকালই অনুভূত হবে। কালের হাত ধরে আবার এগিয়েও যাবে ক্লাব। আমাদের মননের সাক্ষ্যবহ মডার্ণ ক্লাব নামক এই প্রতিষ্ঠানটির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে। সুশৃঙ্খল একদল তরুণ, যুবক ও অভিজ্ঞতালব্ধ প্রবীণদের হাত ধরে ষাট বছর পদার্পণের বর্ণিল এই আনন্দ ক্লাবের শতবর্ষেও অম্লান থাকবে বলে দৃঢ় আশা ব্যক্ত করি। মডার্ণ ক্লাবের গৌরব ও ঐতিহ্যের ছয় দশক পূর্তি আমাদের চলার পথের দিশারী হয়ে থাকুক। আর বছর বছর তার প্রতিফলন ঘটে চলুক 'প্রতিবিম্ব' এর পাতায় পাতায়।

- পার্থ সারথি দেব

সম্পাদক

প্রতিবিম্ব

ক্লাবের স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাস

— শেখর সি. দত্ত

ষাট বছর। আমাদের প্রিয় মডার্ণ ক্লাবের ৬০ বছরে পদার্পণ। ১৯৬৫ সালে বাগদেবীর আরাধনার মধ্য দিয়ে যার সূচনা হয়েছিল কিশোর প্রাণের স্বপ্ন বিভোর আকাঙ্ক্ষার বীজবপন। আজ তো একটি বিরাট গাছ আগরতলায় বিশেষ করে শহর দক্ষিণাঞ্চলে। স্মৃতির গভীরে হাতরে জানবো কেমন করে ১২ জন ছেলে দু'জন অগ্রজসহ শুরু করেছিলাম ক্লাব গঠনের প্রক্রিয়া। কিছুদিন বাদে আরো দু'জন যুক্ত হলে সংখ্যাটি দাঁড়ালো ১৪ জন। সেই স্মৃতি রোমন্থন করবো ষাটতম প্রতিষ্ঠা দিবসের উদ্‌যাপন মুহূর্তে।

কোভিডের সময় ক্লাবের পক্ষ থেকে দুঃস্থদের খাদ্যসামগ্রী প্রদান করা হয়

স্কুল থেকে ফিরে অন্যদিনের মতো নাগেরজলা মাঠে খেলতে যাওয়ার আগে বিপ্লব দেবরায়ের বাড়িতে বসে ঠিক হলো সরস্বতী পূজা করার। কোথায় হবে মিহির চক্রবর্তীর বাড়ির পশ্চিমে বর্তমান শান্তি সরকারের বাড়ি যে জায়গায় হয়েছে। কি নামে করা ? তা অগ্রজ মনুদা ও বিপ্লবদার মাথা থেকেই আসল প্রস্তাব 'মডার্ণ ক্লাব'। শুরু হল আমাদের গর্বের ক্লাবের পথচলা। প্রথম সম্পাদক ও সভাপতি সুবীর কুমার দত্ত (মনুদা), মৃণালকান্তি দেবরায় (বিপ্লবদা)। ১৯৬৮ সালে রাস্তা প্রশস্ত করার জন্যে উদ্যোগ নিলেন আমাদের অভিভাবকরা। মাটির সরু রাস্তা ছিল। একটি বাঁশের সাঁকো ছিল কৃষ্ণের চায়ের দোকানের ওখানে দু'দিক খালি। এই সাঁকো পার হয়ে মেইন রোডে (বর্তমান ট্রফিক পয়েন্ট) উঠতে হতো। আমাদের কাঁচা রাস্তার দু'পাশের সব বাড়ি থেকে জায়গা নেওয়া হয়েছিল, চলছিল ভালই।

হঠাৎ দু'দিন বাদে বিশ্বাস বাড়ির বেড়াটা আগের জায়গায় বসিয়ে দিয়েছিলেন অর্থাৎ পূর্বাবস্থায়। এ নিয়ে অনেক জলঘোলা হয়েছে। কেস হয়েছে ধরপাকড় হয়েছে, মারামারিও হয়েছিল অভিভাবকদের মধ্যে। সম্মিলিত প্রয়াসে যা শুরু হয়েছিল তা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেলো অভিভাবকদের একাংশের পক্ষপাতিত্বে। বিস্তৃত লিখছি না। কারণ ইতিহাস বড় রূঢ়, সবাই সত্যটা হজম করতে পারবে না। আমার কিশোর বয়সে স্বচক্ষে দেখা ঘটনা বিশ্বাস বাড়িকে এককভাবে এরজন্য দায়ী করা যায় না। যাই হোক, অনেক ঝুটঝামেলার পর রাস্তা হয়েছিল আঁকাবাঁকা। বাঁশের সাঁকোটি ওঠে গিয়ে কালভার্ট বসেছিল। এই রাস্তা আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই শুরু হয়েছিল উত্তর বাধারঘাট ভট্টপুকুর সার্বজনীন দুর্গোৎসব। পূজা হতো আমাদের বাড়িতে। এখন যে জায়গায় আমার রাঙ্গাদা মানে শ্রী সঞ্জু দত্ত মহাশয়ের দালান দাঁড়িয়ে আছে। তিন বছরের মাথায় সে দুর্গাপূজাও ভাগ হয়ে গেল, ভাগ হল এলাকাবাসী। স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাব আলাদা পূজা শুরু করেছিল। তারও পরে বাপুজী স্কুলের সামনে নবঐক্য ক্লাবও আলাদা পূজা শুরু করেছিল। ধীরে ধীরে পূজা স্থানান্তরিত হল আমাদের বাড়ি থেকে বিপ্লবদার বাড়িতে। তারপর মডার্ণ ক্লাবের বর্তমান জায়গায় ক্লাবের নামে পূজা শুরু হল। বর্তমান জায়গায় কেন বললাম — একটু পেছনে ফিরে দেখি ১৯৬৮-৬৯ সাল নাগাদ অপু দত্ত-র বর্তমান দালান ঘরের সিঁড়ি কোঠার জায়গায় কাকিমার (শ্রদ্ধেয় প্রয়াত গীতা রাণী দত্ত) অনুমতি নিয়ে ছন-বাঁশের ক্লাবঘর করেছিলাম স্কুল ফাঁকি দিয়ে। আশির দশকে খালের জায়গা কিনে বর্তমান জায়গায় ঘর করেছিলাম এলাকাবাসীর মোড়ের দোকানী ও বাঁশ ব্যবসায়ীদের আন্তরিক সহযোগিতায় এবং বর্ধিত সদস্য সংখ্যার সাহস, উদ্যোগ ও পরিশ্রমে, খেলাধূলা, নাট্যচর্চা ও প্রতিবিম্ব সাহিত্য পত্রিকার প্রকাশ তার পরিচিতি বাড়িয়ে দেয় গোটা আগরতলায়। সে সময়ই মৃন্ময়ী দুর্গার সাথে চিন্ময়ী দুর্গা প্রদর্শন প্রজাপিতা ব্রহ্মকুমারী কেন্দ্রের সহযোগিতায়, মানুষের ঢল নামল। সারা রাজ্যে ছড়িয়ে

পড়েছিল ক্লাবের সুনাম।

১৯৮৫-৮৬ সালে আমরা মডার্ণ ক্লাব উদ্যোগী হয়ে পাশের স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাব ও উন্নয়ন সংঘের সহযোগিতায় এবং তদানীন্তন আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান অমল দাশগুপ্ত মহাশয়ের আন্তরিক সহযোগিতায় (বতর্মান ট্রাফিক পয়েন্ট) মালিদের দোকানের সামনে থেকে উন্নয়ন সংঘ পর্যন্ত দু'দিকে পাকা ড্রেনসহ ২০ ফুট পাকা রাস্তা করতে সমর্থ হয়েছিলাম। এখানে একথাও বলা সঠিক হবে প্রায় একই সময়ে আমরা ইন্দু ঘোষ মহাশয়ের বাড়ির দক্ষিণ-পূর্ব কোণ থেকে বাপুজী স্কুল পর্যন্ত রাস্তাটি প্রশস্ত করার কাজেও হাত দিয়েছিলাম। শুধু চৌহান বাড়ির ওখানে কিছুটা বাঁধা রাখার কাজেও আমরা উদ্যোগ নিয়েছিলাম যা আজও জারি আছে।

নাটক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও খেলাধূলা জারি রেখে ছোট ছোট সাফল্যগুলিকে পাথেয় করে একটু একটু এগিয়ে গেছি। এ ঘরেই সৃষ্টি হলো আমাদের মনন-চিন্তন ও নাট্য চর্চার সংস্থা 'প্রতিবিম্ব'। ১৯৮০ সালের জুনের হৃদয় বিদারক ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার পর 'প্রতিবিম্ব' নামে সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করেছিলাম বছরে দু'বার। এখন শারদীয় সংকলন রূপে প্রকাশ হয়। তারও পরে স্বপ্ন সাধের ছোট্ট পাকা বাড়িতে বড় বড় সাফল্যগুলিকে সুসংহত করে এগিয়ে চলেছি বুকভরা স্বপ্ন সুন্দর অনুভূতি নিয়ে, উপদেষ্টামণ্ডলী ও এলাকার তিন-চারজন প্রবীণ বরিষ্ঠ সদস্য-সদস্যাদের উৎসাহ, অনুপ্রেরণা আর আমাদের আত্মবিশ্বাস ও সাহসে ভর করে। আমাদের উজ্জ্বলতা, উচ্ছলতা ছিল, উল্লম্ফন ছিল না। সাহস ও ক্রোধ ছিল, ক্রোধের বহ্নিশিখায় কাউকে দগ্ধ করিনি।

চলে এলো ক্লাবের হীরক জয়ন্তী বর্ষ — ক্লাবের বর্তমান সভাপতি সজল চক্রবর্তী (ছোট) ও সম্পাদক সঞ্জিত নাহা। হীরক জয়ন্তী বর্ষে বহুধা বিস্তৃত কর্মসূচি নিয়ে উদ্‌যাপন হবে উৎসবের। এই দীর্ঘ পথ চলায় এলাকাবাসীর স্নেহ-ভালোবাসা, সাহায্য-সহযোগিতা এবং আমাদের সবার যোগদানে ক্লাব এগিয়েছে অনেক দূর। দক্ষিণাঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আয়োজনে নাগেরজলার সরকারি খাস জমি পুনরুদ্ধারে এবং ক্লাব সমন্বয় কমিটি গঠনে 'মডার্ণ ক্লাব' নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। চারিদিকে যখন কৈশোর ও যৌবনকে কলুষিত করার আয়োজন পর্যাপ্ত তখন আমরা নৃত্য-গীত, আঁকা শেখা, ছড়া-কবিতা, যোগব্যায়াম প্রশিক্ষণ, ক্রীড়া, রক্তদান ও স্বাস্থ্য শিবির চালু রাখার বিনম্র প্রয়াস জারি রেখেছি। এই নাতিদীর্ঘ লেখায় যা অনুল্লেখ থেকে গেল — দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসরে আমরা খেলাধূলা, নাটক ও শারদীয় পত্রিকা ও শারদোৎসবের উৎকর্ষতার জন্য শুধু আগরতলায় না রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পুরস্কার অর্জন করেছি যা আমাদের ক্লাবের ভূষণকে অলঙ্কৃত করেছে। শুরু থেকে 'প্রতিবিম্ব'এর দায়িত্ব ছিল আমার ওপর। বর্তমানে পার্থ সারথি দেব সে দায়িত্ব বহন করছেন। এখন আমাদের দুঃখ আছে, পরিতাপ আছে অনেকদিন নাটক বন্ধ। সৃষ্টিলগ্নে ঘর ছিল না মাঠ ছিল, এখন ঘর আছে মাঠ নেই। সদস্য সংখ্যা বেড়েছে কিন্তু ক্রীড়াঙ্গন থেকে দূরে।

আজ যখন ৬০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন লগ্নে (১৯৬৫-২০২৪) স্মৃতির গভীরে সন্ধান করে অতীত-বর্তমানের মধ্যে যোগসূত্র বেঁধে এই লেখায় হাত দিয়েছি মনে পড়ে গেল কোথায় ছিলাম, কোথায় এখন দাঁড়িয়ে। আকাশের দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের গর্বের তিনতলা ক্লাবঘর। বর্তমান কর্মকর্তাদেরকে সাধুবাদ জানাই ক্লাবের যুগান্তকারী এই কাজ এবং এলাকার পুকুরটির সংস্কার এলাকার মানুষের জন্য তাকে উৎসর্গ করা পুরসভার সাহায্য এবং পুকুরের তিনপাড়ের বাড়ির মালিকদের সহযোগিতার জন্যে।

কবির অমোঘ বাণী "অন্তর মম বিকশিত কর, অন্তর তর হে, নির্মল কর, উজ্জ্বল কর, সুন্দর কর হে . . যুক্ত কর হে সবার সঙ্গে মুক্ত করে হে বন্ধন"কে মস্তিস্কে ধারণ করে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে চলার প্রত্যয় নিয়ে সব সদস্যরা উৎসবের ছোঁয়ায়, মিলনের উচ্ছলতায়, আনন্দ দোলায় নিজেদের আরো পরিশীলিতভাবে উপস্থাপনের সদিচ্ছায় হীরক জয়ন্তী উৎসব আয়োজন করেছি। "এগিয়ে চলার মন্ত্র মোদের" সামাজিক দায়বদ্ধতা, কৈশোর ও যৌবনের সফল প্রয়োগ এবং উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি। বড়দের সবার আশীর্বাদ ও সাহচর্য্যে আমাদের অগ্রগমনের পথে লাগুক "অরুণ আলোর অঞ্জলি"। আজকের আনন্দ-নন্দনে রুচি-মন-মনন ও সংস্কৃতির সুরভিত সৌরভ আলোকিত করুক আমাদের স্বপ্ন সাধের মডার্ণ ক্লাবকে। আমি বিশ্বাস করি আগামী দিনেও শুভাকাঙ্ক্ষীদের সুপরামর্শ ও যৌবনের সদিচ্ছা কর্মদ্যোগে ক্লাব এগিয়ে যাবে আরো অনেক দূর।

ফিরে দেখা

— শংকর কুমার ঘোষ

সালটা ১৯৬৪ এর শেষ দিক, ১৯৬৫ এর পদার্পণ। পাড়ায় এত ঘরবাড়ি ছিলনা। তখন ঘরবাড়ি হাতে গোনা যেত। তার মধ্যে আমরা সমবয়সি ১২ থেকে ১৪ জন বালক বিকেলে একজোট হতাম বিপ্লব দেবরায়ের (মৃণাল) বাড়িতে। উদ্দেশ্য জলার মাঠে রাবারের বল দিয়ে ফুটবল খেলা। কাদা ও জলে ভরা থাকত সেই মাঠ। আমাদের পাড়ায় কোন অন্য মাঠ ছিল না। যাই হোক খেলার শেষে ভিতরের পুকুর বা সর্দার পুকুরে লাফিয়ে লাফিয়ে জলে পড়া, সেখানে একটু সাঁতার কাটার খেলা - ব্যস তারপর যার যার ঘরে ঢুকে যাওয়া। আমাদের এখানে তখন একটা নামমাত্র ক্লাব ছিল — নামটা জয় হিন্দ ক্লাব। আমাদের চাইতে বড়রা (সংখ্যায় খুবই কম) পাড়ার গলির রাস্তায় দাঁড়িয়েই গল্প-গুজব করতো। সরস্বতী পূজা হতো কিন্তু আমাদের পাড়ায় নয় সেটি হতো বর্তমানে নাগেরজলার ভুঁইয়া বাড়ির সামনে। স্বভাবতই আমরা মনে মনে দুঃখ পেতাম। সেই থেকেই শুরু হয় নতুনভাবে একটি ক্লাব তৈরি করার অভিপ্রায়। তখন যারা ছিল - বিপ্লব দেবরায় (মৃণাল), মনিদা (সুধীর দত্ত), অপু (স্বপন দত্ত), শংকর ঘোষ, দীপক দেবরায়, তুষার দেবরায় (বিপ্লব), রতন দেব, স্বরাজ দেব, হিমাদ্রী সাহা, সমর রায়, পিন্টু দত্ত (শেখর), প্রবীর ভট্টাচার্য, স্বপন দেবরায়। একদিন তার রূপরেখা তৈরি করার লক্ষে বিপ্লব দেবরায় (মৃণাল) এর বাড়িতে বসে সিদ্ধান্ত নিলাম ক্লাব হবে। এর নাম হবে মডার্ণ ক্লাব। ক্লাব তো হল কিন্তু ক্লাবঘর নেই। ক্লাবঘর তৈরি করতে আমরা বদ্ধপরিকর। শুরু হল বাঁশ, ছন জোগার করার পরিকল্পনা। জায়গা নেই সিদ্ধান্ত হল সাধন চক্রবর্তী মহোদয়ের বাড়ির পেছনে ও সমর রায়ের বাড়ি যেতে একটা ফাঁকা জায়গা রয়েছে সেখানেই হবে আমাদের ক্লাবঘর। কামলা (কারিগর) লাগানোর পয়সা নেই। তাই নিজেরাই মুলি বাঁশের তরজার কাজে হাত লাগালাম। বিপ্লব ছিল আমাদের চাইতে অনেক অভিজ্ঞ। ১৯৬৫ সালে আমাদের বহু প্রতীক্ষিত খুব ছোট আকারে প্রথম ক্লাবঘর নির্মিত হল। সেদিনের আনন্দ-আবেগ হৃদয়ের ভেতর খল খল করে বইতে শুরু করেছিল। আজও মনে পড়ে সেদিনের প্রথম সন্ধ্যায় মোমের আলো জ্বালিয়ে ক্লাবঘরে ক্ষণিকের রাতের অন্ধকারকে আলোর মালাতে অনুভব করেছিলাম। নিঃষ্পাপ প্রাণের অনুভূতি তখন বিদ্যুতের খুঁটিতে কোন আলো জ্বলত না। বিশেষ করে গলিগুলিতে। ১৯৭১ সালে আমরাও কৈশোরে পা দিতে শুরু করেছি। এই ছোট পরিসীমায় ক্লাবঘরে কিছু শূন্যতার অভাব বোধ করতে থাকলাম সবাই। আর একটু বড় ঘর চাই। ঠিক করলাম অপুদের বাড়ির সামনে মোটামুটি একটি ফাঁকা জায়গা রয়েছে, সেখানে যদি আমাদের ক্লাবঘরটি সরিয়ে আনা যায়! সবাই মিলে অপুর মায়ের (শ্রীমতী গীতারানি দত্ত) কাছে গিয়ে ক্লাবঘরের কথা বলতেই উনি রাজি হয়ে গেলেন। শুধু রাজিই নয়, সুন্দরভাবে ক্লাব তৈরি করে সুন্দরভাবে আমাদের চলার পরামর্শ দিলেন। গীতারানি দত্ত তিনি ছিলেন অতি সহজ-সরলা ও বাস্তবমুখী মহিলা। আমাদের অভিভাবকরা ক্লাবের কথায় যখন নাক সিঁটকাতেন, উনি কিন্তু আমাদেরকে ও আমাদের ক্লাবঘরকে নির্দ্বিধায় সমর্থন করে গেছেন। উনি আজ আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু উনার কথা সহজ-সরলতা বাস্তবমুখী চিন্তা হৃদয়ে নাড়া দেয় আজও। আমি বা আমরা উনার আত্মার সদ্‌গতি ভগবানের নিকট কামনা করি।

চলে আসি আমাদের ক্লাব পরিচালিত প্রথম বড় ঘরে সরস্বতী পূজা প্রসঙ্গে। আমাদের ক্লাবে তখনও সংবিধান রচনা হয়নি বা তার বিশেষ দরকারও বোধ হয়নি। কমিটি বলতে মুখে মুখেই আমরা কমিটি গঠন করলাম এবং আমার স্পষ্ট মনে আছে প্রথম সম্পাদক হিসাবে বিপ্লব (মৃণাল) কেই বেছে নিয়েছিলাম এবং তার আদেশানুসারেই আমরা চলতাম। প্রথমবার ক্লাবের রসিদ ছাপানো হলো। রসিদ নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম চাঁদা আদায় করার লক্ষ্যে এবং তখনকার সময়ে চাঁদা উঠেছিল ২০০ টাকার কিছু বেশি। ডেকোরেশন করতে হবে এবং সেটাতে আমিই থাকতাম অগ্রণী ভূমিকায়। একটিমাত্র বাল্ব জ্বালিয়ে পূজা হয়েছিল। পিন্টুদের বাড়ি থেকেই লাইন আনা হয়েছিল। একটা বিষয়ে আমরা জয়ী হয়েছিলাম। অভিভাবকদের আমাদের মণ্ডপ দেখে মুচকি হাসা। সে যে আমাদের কত বড় জয়— তা লিখে বোঝানো সম্ভব নয়।

এবার শুধু পুজো নয়, অন্য কথা চিন্তা করতে হবে। সংস্কৃতিতে আমরা কেউই গান-বাজনায় যুক্ত ছিলাম না। অগত্যা মাথায় এলো নাটক করতে হবে। নাট্য সংস্থার নাম

দেয়া হল 'নবারুণ নাট্য সংস্থা'। নাটক নিয়ে মেতে উঠলাম। প্রথম নাটক আমারই লেখা 'এদের প্রশ্ন'। শুরু হল ক্লাবঘরে রিহার্সেল। পরিচালক আমরা সবাই। দারোগাবাড়ির মাঠে (স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাবের) অপরদিকে ছোটখাটো মাঠের মত ছিল। সালটা ১৯৭২। নিজেরাই সকাল থেকে মঞ্চ তৈরি করতে লাগলাম। বিভিন্ন বাড়ি থেকে চকি জোগার, মা, মাসি, দিদিদের থেকে কাপড় সংগ্রহ করে স্টেজ তৈরি হল। মেকআপ আমিই করতাম। যথারীতি সন্ধ্যায় আমাদের নাটক মঞ্চস্থ হল। সেই নাটকে আমরা সবাই প্রশংশিত হয়েছিলাম। এরপর শুরু হল নাটক যুগ। পরপর আমরা দারোগা মাঠে চারটি নাটক মঞ্চস্থ করেছিলাম। বড়দোয়ালী স্কুলে আমরা প্রথমবার নাটক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করি। সেখানে আমাদের কলাকুশলীরা প্রশংশিত হয়েছিল। ধীরে ধীরে পাড়াতে সমবয়সি বন্ধু বাড়তে লাগল। যেমন — সজল চক্রবর্তী, চন্দন চক্রবর্তী, আশিস রায় (কাঞ্চন), সজল চক্রবর্তী (বড়), সনৎ রায়চৌধুরী, শংকর চক্রবর্তী। ক্লাবের শক্তি দ্বিগুণ বেড়ে গেল। ক্লাবের উদ্যোগে প্রথম সামাজিক কাজ হয়েছিল বর্তমান রাস্তাটিকে প্রসারিত করা এবং তাতে আমরা সফল হয়েছিলাম। এবার শুরু হল ক্লাবের একটি স্থায়ী জায়গার সন্ধান। আমাদের ক্লাব যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেই জায়গাটি ছিল একটি খাল। যে জায়গাটি এখন আমাদের সে জায়গাটি ছিল স্থানীয় শ্রী দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দেবরায় মহোদয়ের। সবাই মিলে ঠিক করলাম উনাকে জায়গাটি ক্লাবের জন্য দান করার জন্য বলব। আমাদের নিবেদনে উনি সাড়া দিলেন এবং অতি নগণ্য কিছু অর্থের বিনিময়ে ক্লাবের নামে জায়গাটি লিখে দিলেন। এই মহানুভব মানুষটির কথা যদি এখানে উল্লেখ না করি তবে বিশ্বাসঘাতকের খাতায় নাম লিখাতে হবে। খালের উপর কাঠের খুঁটি বসিয়ে তরজার পাটাতন বসিয়ে- ছনের চাল দিয়ে তৈরি হল খুবই সুন্দর ক্লাবঘর। তৈরি হল ক্লাবের সংবিধান। নবারুণ নাট্য সংস্থার নাম বাদ দিয়ে হল 'প্রতিবিম্ব সংস্কৃতি সংস্থা'। শিশুদের আঁকা শেখা, গানের, আবৃত্তির ও নাচের স্কুল খোলা হল। পেছনে ফিরে তাকানোর কোন অবকাশ নেই। এগিয়ে যেতে হবে। উত্তরপূর্বাঞ্চলে সবচাইতে বড় নাটক প্রতিযোগিতায় (শেখর স্মৃতি একাঙ্ক নাটক) খোয়াইতে আমরা অংশ নিলাম। মোট ২৬টি নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল। তার মধ্যে আমরা তৃতীয় শ্রেষ্ঠ নাটক হিসেবে বিবেচিত হলাম। সাথে ব্যক্তিগত পুরস্কারও এলো। ফুটবল প্রতিযোগিতায়ও আমরা শহরে সাড়া ফেলেছিলাম। দেখতে দেখতে রজতজয়ন্তী বর্ষে পা দিলাম — এই রজতজয়ন্তী বর্ষে সারা ত্রিপুরাতে নজির সৃষ্টি করলাম। পশ্চিবঙ্গের তখনকার স্বনামধন্য উঠতি গায়ক অমৃত সিং অরোরা, হেমন্ত কণ্ঠি উঠতি গায়ক, গায়িকা তথা নায়িকা ও আরো দু'জন গায়ককে দিয়ে ত্রিপুরাতে প্রথম ওপেন স্টেজে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বিশিষ্ট সমাজসেবী, ক্রীড়াবিদদের আমরাই প্রথম সংবর্ধনা দেয়ার প্রথা শুরু করেছিলাম। এটা আমাদের গর্ব। বিভিন্ন সামাজিক কাজ যথা স্বাস্থ্য শিবির, শিশুদের নিয়ে অনুষ্ঠান, ক্রস কান্ট্রি দৌড় ,ক্যারাম, ব্যাডমিন্টন, ক্রিকেট, নাচ, গান, আবৃত্তি, ক্যুইজ প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান আমাদের ক্লাবের অলংকার।

ক্লাবঘর দালানে পরিণত হল এবং পা দিলাম সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষে। এই বছরটিও বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচি, প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান, সমাজের গুণীজনদের সম্বর্ধনা শিক্ষামূলক নাটক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এনিয়ে এখনো অনেকেই আলোচনা করেন। মাঝে একটি কথা লিখতে পারিনি — আমাদের ক্লাব চেয়েছিল সর্দার পুকুরটিকে সরকার অধিগ্রহণ করে সার্বজনীন জলাশয় হিসেবে গড়ে তুলকে। যদিও সেটি আমরা করতে পারিনি কিছু স্বার্থান্বেষী জ্ঞাতি শত্রুদের বাধা দানে। আমরা তা করতে পারতাম তবে এক অপ্রীতিকর ঘটনার ঘটে যেতে পারবো। আমাদের ক্লাব সর্বদাই শান্তির পক্ষে থেকেছে এবং থাকবে। তবে আমাদের জয় হয়েছে। ঐ সময় যারা এই মহান কাজের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল আজ তারাই স্বীকার করছে যে এই সুন্দর জলাশয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বা বাধা দান করে অপরাধ করেছেন। এটাই আমাদের সবচাইতে বড় জয়। শান্তির ও সুষ্ঠু বাতাবরণের জয়। তারপরও একটি পুকুরকে সার্বজনীন পুকুরকে হিসেবে নামকরণ করতে পেরেছি। এতে অবশ্যই মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন ক্লাব সভাপতি সজল চক্রবর্তী। তার ঐকান্তিক চেষ্টায় এবং সবার সহযোগিতায় সুন্দর রূপ দেয়ার কাজ চলছে।

আবারও দেখতে দেখতে চলে এসেছে হীরকজয়ন্তী বর্ষ। এই মহান বর্ষটিকে আরো সুন্দর ও অধিক গ্রহণযোগ্য করে তুলতে আমাদের নব প্রজন্ম তৈরি হচ্ছে এবং শুভেচ্ছা অবশ্য তাদের প্রাপ্য। আমার লেখার শেষে একটি আবেদন ক্লাব সদস্য/ সদস্যা বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাদের নিকট — আমাদের প্রেরণাদায়িনী শ্রীমতী গীতারানি দত্ত ও মহামান্যবর শ্রী দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দেবরায়ের নামে ক্লাবের দুটি কক্ষ স্মৃতি কক্ষ হিসেবে চিহ্নিত করার। এটা আমার ব্যক্তিগত আবেদন মাত্র। ঝড়-তুফান মোকাবিলা করে এগিয়ে চলুক আমাদের প্রাণের ক্লাব।

স্মৃতির পাতা থেকে

— সঞ্জু দত্ত

এই তো সেদিন শীতের বিকেলে অস্তায়মান সূর্যের নিস্তেজ উষ্ণতায় ছাদবাগানে ফুলগাছগুলোর পরিচর্যা করছিলাম। হঠাৎ শুনি সাইরেন বাজিয়ে একটা Ambulance আসছে। দেখলাম আমাদের বাড়ির পরের বাড়িটার সামনেই ট্রাক গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। Ambulance টা একটু শ্লথগতিতে ট্রাকটা পেরিয়ে হুস্ করে চলে যাচ্ছে উপরের দিকে।

মনটা চট করে পিছিয়ে গেল প্রায় ৬০/৬৫ বছর আগেকার এই রাস্তাটির কথা ভেবে। সেদিন এই রাস্তাটি অর্থাৎ মডার্ণ ক্লাব থেকে একটু এগিয়ে ডানদিকে বাঁক নিয়ে বাপুজী স্কুলের দিকে, আর বাঁক না নিয়ে উপরের দিকে সোজা গেলে উন্নয়ন সংঘ অভিমুখে। রাস্তাটির আকৃতি বেশ সরু ছিল। ৭ ফুট চওড়া, মাটির রাস্তা একদিকে সংকীর্ণ নর্দমা। আমাদের বাড়ির পর থেকে রাস্তাটি সমতল থেকে ক্রমশ উচ্চতায় ছিল। বাজারের থলে হাতে বাড়ির কর্তারা, স্কুলের ছেলে-মেয়েরা, অফিসের বাবুরা আর পেশার দাগিদে মানুষজন এই ছিল নিত্য পথযাত্রী। জনসংখ্যার চাপ ছিল কম। কদাচিৎ ২/১টা রিক্সা আসত। কখনো যদি এই রাস্তায় ছোট গাড়ি অর্থাৎ ঐ সময়কার জিপগাড়ি আসত আমরা ছোটরা দৌড়ে বাড়ির গেটে এসে দেখতাম আর আনন্দে হাততালি দিতাম। বড় গাড়ির এই রাস্তায় চলাচলের পরিসর ছিল না।

মডার্ণ ক্লাবের পুরনো বাড়ী

পরবর্তীতে, একটা দুঃখজনক ঘটনা এলাকার ছোট-বড় সবাইকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল এবং রাস্তাটিকে প্রশস্ত ও উন্নত করার আশু প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করল। তখন সম্ভবত আমি স্কুলে ক্লাশ ইলেভেন-এ কিংবা কলেজের প্রথম বর্ষে পড়ি। সময়টা ১৯৬৪-৬৫ হবে। আমাদের বাড়ির উল্টোদিকে মিতাদের বাড়ি থেকে শুরু করে শ্রী চন্দন করের বাড়ি, শ্রী সুনীল দাসের বাড়ি ও শ্রী কমল দেবের বাড়ি পর্যন্ত সবটা জায়গা নিয়ে রাস্তা থেকে এক থেকে দেড় ফুট উঁচুতে একটা বিরাট মাঠ ছিল আর একদিকে রাস্তার সমতলে বর্তমান 'Kidjee' ছিল একটা ছোট মাঠ। দুই মাঠের মাঝখান দিয়ে মূল রাস্তা থেকে পশ্চিমদিকগামী ৩ ফুটের প্রশস্ত একটা গলিপথ ছিল, যা এখন ৫ ফুট প্রশস্ত। ঐ গলির বাঁ হাতি দ্বিতীয় বাড়িটি ছিল আমার পিসিমার। বাড়িতে ৪/৫ ঘর ভাড়াটে ছিলেন। একদিন বেলা ১২টার দিকে আমরা ক'জন ঐ ছোট মাঠে আড্ডা দিচ্ছিলাম। হঠাৎ পিসিমার বাড়ির কোন এক ঘর থেকে 'আগুন, আগুন' চিৎকার শুনলাম। আমরা সবাই দৌড়ে গেলাম। মুহূর্তের মধ্যে আগুন বড় হয়ে উঠল। সবাই মিলে লাগোয়া পুকুর থেকে জল এনে আগুন নেভাতে ব্যস্ত। আগুনের তুলনায় সেই চেষ্টা কিছুই না। Fire Brigade-এ খবর গেল। Fire Brigade এলো বড় রাস্তার প্রয়াত গোপাল দেবের দোকান (অধুনা মালির দোকান) পর্যন্ত। সরু রাস্তায় গাড়ি আর ঢুকতে পারছে না। গাড়ি ঘুরে মিলন সংঘের দিক দিয়ে দু'পাশের কোন কোন বাড়ির সীমানার বাঁশের বেড়া ভেঙ্গে ঘটনাস্থলের কাছে এলো। আগুন নেভাতে সাহায্য করল। কিন্তু, ততক্ষণে আগুনের লেলিহান শিখায় সব ভস্মীভূত। ৪/৫টি পরিবার সব হারিয়ে পথে বসলো। এই অগ্নিকান্ডের ঘটনা সবাইকে বুঝিয়ে দিল যে বাড়িঘর রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় রাস্তাঘাট কতোটা জরুরি।

এরপর রাস্তাটা নিয়ে বড়দের মধ্য নতুন করে ভাবনা শুরু হল। ঐ সময় রাস্তাটা ৮ ফুটের কম প্রশস্ত ছিল। পুরকর্তাদের সাথে অভিভাবকগণ যোগাযোগ করার পর জানা গেল যে দু'পাশের জায়গার মালিকগণ যদি স্বেচ্ছায় জায়গা দিয়ে রাস্তাটাকে ৮ ফুট থেকে ১২ ফুট করে সরকারকে দিতে পারেন তবেই তারা এটিকে মাটি ফেলে ইটের সলিং

করে ভবিষ্যতে পাকা করে দেবেন। এলাকাতে অভিভাবকদের উদ্যোগে একাধিকবার সভা হলো, আলোচনা হলো। কিন্তু সবাই ২ ফুট করে জায়গা ছাড়তে অসম্মত। কারণ, কারো কারো ছোটখাটো Temporary construction সরাতে হবে, সরানোর জায়গা নেই, ফলন্ত গাছপালা কাটা যাবে ইত্যাদি। অনেক ক্ষতি হবে। কথাগুলো পুরো অসত্য নয়। তবে রাস্তাটিও যে খুবই প্রয়োজন।

এদিকে সর্দার পুকুর সন্নিহিত এলাকার আমরা নব্য যুবকেরা মাঝে মাঝেই দা-কোদাল নিয়ে মিলিত হতাম যদি দু'পাশের বাড়ির মালিকদেরকে বুঝিয়ে রাস্তার জন্য একটু জায়গা বের করা যায়। কিছুটা হলো, কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। তবে, জায়গা প্রদান ও রাস্তার উন্নতির বিষয়টা সবার মনেই জাগ্রত ছিল।

ইতিমধ্যে আমাদের ছোটদের দ্বারা গঠিত পুরানো Friends Association এর সাইনবোর্ড পাল্টিয়ে সেই ছোটদের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হলো Modern Club, 1965 সালে। মডার্ণ ক্লাবের Founder Member ছিলেন ১৪ জন। যাঁদের বয়স এখন ৭০ বৎসরের কোঠায়। প্রথম কয়েক বছর Modern Club সরস্বতী পুজোতেই সীমাবদ্ধ ও নিজেদের খেলাধূলা নিয়েই ব্যস্ত ছিল। কয়েক বৎসরের মধ্যে রাস্তাটাকে প্রশস্ত ও আরো ভালো করার ভাবনাটা ওদের মধ্যে ঢুকলো। ওরা বুঝলেন এর গুরুত্ব। পাশাপাশি এলাকার অনেক যুবকেরা ঐ সময় Modern Club এর সদস্য/ সমর্থক হলেন। এলাকার অভিভাবকগণের সাথে Modern Club এর পরিচালন সমিতি/ সদস্যদের আলোচনা হলো রাস্তার বিষয়ে। ক্লাবের সংগঠিত শক্তি এগিয়ে আসায় রাস্তার ঝিমিয়ে পড়া চেষ্টাটা গতি পেল। সবাই মিলে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো যে এই রাস্তার দু'দিকের নর্দমাসহ মোট ২০ ফুট পাকা করতে হবে। সার্বিক স্বার্থে পাড়ার দু'পাশের বাড়ির মালিকদের সাথে কথা বলে জায়গা নিতে হবে। সোজা পথে না হলে বিকল্প পথ গ্রহণ করতে হবে একান্ত প্রয়োজনে। সরকার থেকে পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছিল যে রাস্তার জায়গার জন্য কোন Compensation দেওয়া যাবেনা। তাই জায়গা যেন সবাই স্বেচ্ছায় দান করেন। এদিকে জায়গা দেওয়ার বিষয়ে কয়েকজন অসম্মত ছিলেন। নিজেদের মধ্যে বিভাজন তৈরি হয়েছিল। আমাদের সাথে আলাদা করে আলোচনা করা হলো, তবু কিছু সমস্যা ছিল। ক্লাবের মধ্যে দিনের পর দিন আলোচনা হয়েছিল। অনেক গোপন সভাও হয়েছিল কৌশলগত কারণে। আমাদের প্রতিবেশী অনেক ক্লাবের সাথে সাহায্য চাওয়া হয়েছিল।

রাস্তার আন্দোলনকে ওরা সমর্থন করেছিলেন এবং জায়গা দখলের নির্ধারিত দিনে ঐসব ক্লাবগুলো থেকে কয়েকজন করে Modern Club এর সাথে প্রস্তুত হয়ে যোগদান করেছিলেন। আন্দোলনটা সুশৃঙ্খলভাবে একটা বিশাল চেহারা নিয়েছিল। নির্দিষ্ট দিনে ঠিক সময়ে পূর্ব পরিকল্পনা মত বিশাল সংখ্যক কিশোর ও যুবক বাহিনী দা-কোদাল-শাবল-টুকরি ইত্যাদি নিয়ে সমবেত হলো। প্রবীণ অভিভাবকগণের পরামর্শ নেওয়া হয়েছিল, ওদের সামনে আসতে দেওয়া হয়নি। সার্বিক স্বার্থে রাস্তার উন্নয়নের জন্য Modern Club এর উদ্যোগে এই সম্মিলিত শক্তির মানসিকতা ও ঐক্য দেখে অনিচ্ছুক জায়গা দাতাগণ সেভাবে প্রতিরোধ করতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত প্রয়োজনীয় জায়গার দখল নিয়ে পিলার গাঁথা হলো। প্রায় সবাইকে দেড় ফুট থেকে সাড়ে তিন ফুট জায়গা ছাড়তে হয়েছিল। অনেকের ছোটখাট Temporary construction, কুয়ো, দামী ফলন্ত গাছ নষ্ট হলো। শেষ পর্যন্ত, এলাকার অভিভাবক ও Modern Club এর উদ্যোগে ও অন্যান্য সকলের সমবেত চেষ্টায় রাস্তার আন্দোলন সফল হলো। রাস্তা ও দু'দিকের নর্দমার জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা সরকারের নিকট বুঝিয়ে দেবার পরে সরকার মাটি, ইটের সলিং ও পরে নর্দমাসহ পাকা রাস্তা করেছে জনগণের জন্য। উপ

রের এই চিত্রটা (সংক্ষেপিত) পড়ে আজকের প্রজন্ম অর্থাৎ আমাদের ছেলেমেয়েরা কিংবা যাঁরা এই এলাকায় পরবর্তী সময়ে বাড়ি ভাড়া করে বসবাস করছেন বা জায়গা ক্রয় করে, ফ্ল্যাট কিনে এসেছেন, তাঁরা কেউ ভাবতেই পারবেন না এই রাস্তার জন্য সেই সময়কার মানসিকতা, তীব্রতা ও একতা। পরবর্তী সময়ে, পূর্ব উল্লিখিত রাস্তার জায়গা দান নিয়ে যে মনোমালিন্য ও বিভাজন তৈরি হয়েছিল তা ক্রমশ দূরীভূত হয়েছে এবং বর্তমান সময়ে আমরা সবাই সুন্দর ও স্বাচ্ছন্দ্যে এই রাস্তাটিকে ব্যবহার করে বসবাস করছি।

১৯৬৫ সালের পর থেকে এই ৬০ বছরে অর্থাৎ Modern Club এর 'হীরকজয়ন্তী বর্ষ' উদ্‌যাপন পর্যন্ত যতো কিছু কৃতিত্ব অর্জন করেছে তার মধ্যে এই রাস্তাটির দু'পাশের পাকা ড্রেইনসহ প্রশস্তিকরণ ও উন্নতিকরণ কাজটিই মনে হয় এই প্রতিষ্ঠানের মাথায় সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরবের পালক। আমাদের এলাকাতে যে সুস্থ ও সাংস্কৃতিক চিন্তার পরিবেশ রয়েছে তার জন্য ও Modern Club প্রশংসা দাবি করতে পারে।

আগের মোগড়া রোড। এখনকার হরিগঙ্গা বসাক রোড

কোথায় যে হারাল

— দিলীপ দাস

তখনও কিছু কিছু জায়গায় মোগড়া রোড-এর সাইনবোর্ড ছিল। পরিবর্তন করা হয় নি। কামান চৌমুহনিতে, এখন যেখানে শাঁখা-সিঁদুর, বিয়ের মুকুট, মালা ইত্যাদির ঝকঝকে আলোকোজ্জ্বল দোকান, তারই একটি দোকানের বাঁশের বন্ধ ঝাঁপে কালো রঙের উপর সাদা অক্ষরে অপটু হাতে লেখা ছিল– মোগড়া রোড।

সালটা ছিল ১৯৬৪। সদ্য দেশত্যাগী এবং আগরতলায় নতুন আগন্তুক এক ভ্যাবলাকান্ত বালক তার পিতাকে জিজ্ঞেস করল, বাবা, এই পথটার নাম মোগড়া রোড কেরে? বালক মোগড়ার নাম জানত। তার ঠাকুরমার সঙ্গে বহুবার মোগড়া স্টেশনে নেমে রেলের পোলের উপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ভয়ে ভয়ে নদী পার হয়ে ঠাকুমার বাপের বাড়ি রাউৎহাটে বেড়াতে গেছে সে। তখন বানান করে সে কিছু কিছু পড়তে পারে। সিমেন্টের সাইনবোর্ডে তখন সে দেখেছিল, স্টেশনের নাম গঙ্গাসাগর। ঠাকুমা বলত মোগড়া। তাই মোগড়া নামটা তার মনে ছিল। প্রায় জনশূন্য স্টেশনের পেছনেই ছিল বিশাল বড় এক দিঘি। তাদের বাওনবাইড়ার ট্যাঙ্কের দিঘি (আসল নাম লোকনাথ দিঘি)র থেকেও কয়েক গুণ বড়। দিঘির এপারে দাঁড়ালে ওপারের মানুষটাকে ছোট দেখাত। বালক খুব অবাক হয়ে এই দিঘি দেখত। এর নামই গঙ্গাসাগর আর তার থেকেই স্টেশনের নামও গঙ্গাসাগর স্টেশন। কিন্তু গঙ্গাসাগর ওরফে মোগড়া এই আগরতলায় এল কি করে, এটাই বালকের বিস্ময়ের কারণ। এই বিস্ময় থেকেই বালকের জিজ্ঞাসা – রাস্তাটার নাম মোগড়া কেন? তার বাবা জানাল, এই রাস্তাটা সোজা মোগড়া গেছে, তাই এর নাম ছিল মোগড়া রোড। এখন এর নাম পাল্টে হয়েছে হরিগঙ্গা বসাক রোড। বালক বিস্ময়ে চারিদিকে তাকায়। যা দেখে তাই নতুন লাগে। তাদের বাওনবাইড়াতে এত দালান কোঠা নেই। একটা গোল জায়গায় একটা মরচে ধরা কামান। কামানের চারদিকে আগাছা। কামানটি খুব যত্নে নেই। এই কামান থেকেই যে জায়গাটার নাম কামান চৌমুহনী তার বাবা বুঝিয়ে বলল। বালক পথ হাঁটে আর ডানে বাঁয়ে ঘাড় উঁচু করে সাইনবোর্ড দেখে আর বানান করে পড়ে। কামান চৌমুহনী থেকে রাস্তার দু-পাশে মোটা থামওয়ালা দোকান। মোটর স্ট্যাণ্ড থেকেই থামওয়ালা দোকানের শুরু। তবে দোকানগুলোতে লোকের ভিড় তেমন নেই। কেমন যেন ঠাণ্ডা ভাব।

কামান চৌমুহনী থেকে যে রাস্তাটি পশ্চিম দিকে গেছে সেটি পোস্ট অফিস চৌমুহনী হয়ে আরও দূরে বটতলাতে গেছে। বালক তখনও বটতলা দেখেনি। জায়গাটিকে তার অনেক দূরের বলে মনে হল। কামান চৌমুহনীতে একটা দোকানের নাম অঞ্জনা রেস্টুরেন্ট। বালক রেস্টুরেন্ট কি তা জানে না। দোকানটিতে চেয়ার টেবিল পাতা। আধ অন্ধকার। যেন শীত জমে আছে। কিন্তু লোকজন নেই। মোটা মতো একজন লোক গেঞ্জি গায়ে বসে আছে।

রাস্তায় লোক চলাচল খুব কম। রিক্সাও খুব বেশি নেই। বেশির ভাগ লোকই হেঁটে চলাচল করে। কেউ কেউ সাইকেলে যায়। কারও যেন কোনও তাড়া নেই। লোকের জটলা তো নেই-ই। রাস্তার এপাশ ওপাশ যেতে সাবধান না হলেও চলে। গাড়িও তেমন নেই। যাও কয়েকটা তার বেশির ভাগই জিপ গাড়ি। প্রায় সবই

পুরোনো। মুড়ির টিনের মতো বাসের দেখা মেলে একমাত্র মোটরস্ট্যাণ্ডে গেলে। ওখানেই হাতে গোনা দুচারটে রিক্সা একসঙ্গে দেখা যায়। কেউ বেল বাজায় ক্রিং ক্রিং, কেউ পোঁ পোঁ করে ভেঁপু বাজায়। গাড়িতে তখনও কর্ণ বিদারী ইলেকট্রিক হর্ণ আসেনি। তাই তাতেও ভেঁপুই বাজানো হত, তবে সাইজ ছিল আরও বড়। ফলে আওয়াজও বেশি হত। গাড়িগুলোরও ছিরিছাঁদ তেমন ছিল না। সেই কবে যেন রং করা হয়েছিল, তারপর আর ও কর্মটি করা হয় নি। গাড়ির দু-পাশে কাঠের বেঞ্চি, মধ্যেও একটা বেঞ্চি। তবে মধ্যের বেঞ্চি ছিল একটু চওড়া। তাতে পিঠে পিঠ লাগিয়ে লোকজন বসত। রাস্তাঘাটের হালও তথৈবচ। ভাঙাচোরা রাস্তায় গাড়ি এত ঝাঁকুনি খেত যে সওয়ারির প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে পড়ত। কোমর ব্যাথা যাদের তারা যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠত। সে এক প্রাণান্তকর যাত্রা। বাস ড্রাইভারের পেছেনেই ছিল লম্বা ফালি মতো কেবিন। তাতে পয়সাওলা লোকেরা স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সমভিব্যাহারে যাতায়াত করত। গাড়ি চলত ধীর গতিতে এবং তাড়াতাড়ি চলার কোনও ব্যাপার ছিল না। সওয়ারিরা জানত, কখন বাড়ি পৌঁছাবে তার কোনও ঠিক-ঠিকানা নাই। গাড়ি ছাড়ার কোনও টাইমটেবিল ছিল না। প্যাসেনার উঠে উপচে পড়লে এবং ড্রাইভারের মর্জি হলে তবেই গাড়ি ছাড়বে। বাকি সময় অনন্ত অপেক্ষায় বাস দাঁড়িয়ে থাকত এমন ভাবে যেন তার কোথাও যাবার একেবারেই ইচ্ছে নেই।

কামান চৌমুহনি থেকে দু-পা এগোলেই বাঁ দিকে চোখে পড়ত একটা দোকানের সামনে বড় একটা দাড়িপাল্লা ঝুলানো। তাতে ওজন করে টিন ভর্তি রাব বিক্রি করা হত। আর ছিল তামাকের কড়া গন্ধ। রাস্তা দিয়ে গেলেই ভেসে আসত। বড় কাঠের থালায়, লোকে বলত চাড়ি, তাতে মাখানো থাকত তামাক। একটিতে অর্ডিনারী তামাক, অন্যটিতে অম্বুরি তামাক। বেশ মিষ্টি গন্ধ ছিল এই তামাকের, অনেকটা জর্দার গন্ধের মতো। বালকের দাদু ছিলেন তামাক রসিক, তিনি অম্বুরি তামাক কিনে নিতেন। তামাকের এত বড় দোকান সে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে দেখেনি। তার বাবা বলেছিলেন, এই তামাক ব্যাবসায়ীর বাড়ি ছিল ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে। তাঁর নাম গোপাল সাহা। তামাকের ব্যাবসাটিকে তিনি তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত করে নিয়েছিলেন। তামাকের দোকানের একটু পরেই একটি লম্বা কাপড়ের দোকান। সাইনবোর্ডে বড় বড় অক্ষরে লেখা দত্ত স্টোর্স। দোকানের ক্যাশবাক্সের সামনে বেঁটেখাটো পৃথুল একজন বসে থাকতেন। পরনে ধোপদুরস্ত ধুতিপাঞ্জাবি পরিহিত সমীহ জাগানো একজন লোক। তার বাবা বলতেন, দত্ত স্টোর্সের মালিকও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার লোক। আর একটু এগোলেই একটি রেডিমেড কাপড়ের দোকান। দেখলেই বোঝা যায় খুব অভিজাত বিপণি। রেডিমেড কাপড়ের এত বড় দোকান আগরতলায় আর একটিও ছিল না তখন। সবচেয়ে বিস্ময়ের দোকানের আলমারিতে ফ্রক পরা একটি বালিকার মূর্তি! কেমন জীবন্ত মনে হত। আরও আশ্চয্যের হল দোকানটিতে কোনও ক্রেতা দেখা যেত না। দেখতে সুপুরুষ স্বাস্থ্যবান একজন লোক অলসভাবে বসে থাকতেন। তিনিই দোকানের মালিক। দোকানটির তখন খুব পড়তি অবস্থা।

আর একটু এগোলেই সূর্য চৌমুহনি। সূর্য পাল নামে এক ব্যাবসায়ীর নামে এই চৌমুহনি এবং তাঁর নামেই একটি সিনেমা হলও আছে, যার নাম সূর্যঘর। সবাই বলে নতুন সিনেমা হল। রোজ তিনটি শো। ম্যাটিনি, ইভনিং আর সেকেণ্ড শো। এই তিনটি শো-র সময়েই বেশ লোক সমাগম হয়। জায়গাটা তখন জমজমাট হয়ে ওঠে। অন্য সময় কেমন যেন গাছাড়া ভাব। এলোমেলো লোক চলাচল। সূর্য চৌমুহনির ডান দিকে ছিল আরেকটি বড় কাপড়ের দোকান – সিদ্ধিগোপাল বস্ত্রালয়। বেশ বড় দোকান। বিরাট একটা সাইনবোর্ড। তাতে নাড়ু গোপালের ছবি। বালক খুব অবাক হয়ে ছবিটা দেখত। এরপরই আরেকটি সিনেমা হল। সামনে উঠোন মতো একটু ফাঁকা জায়গা। শোর আগে টিকেট কাটার জন্য এখানে খুব ভিড় হয়। হলটির নাম রূপছায়া। পুরোনো ধূসর হয়ে যাওয়া এই হলেই ফাইটিং ছবি বেশি দেখানো হত। হলের সামনেই বাঁ দিকে কাঁচের দরজা দেওয়া একটা মদের দোকান। যারা ওই দোকানে ঢুকত লোকে তাদের ভাল চোখে দেখত না। ডান দিকে ছিল সৌরাষ্ট্র হোটেল। এরকম নাম কেন বালক তা বুঝতে পারত না। তবে নামটা তার ভাল লাগত। সৌরাষ্ট্র হোটেলের নীচেই জৈন টেক্সটাইল। এর দুয়েকটা দোকান পরে

হকার্স কর্ণারের রাস্তা। তার পরেই একটি বড় মিষ্টির দোকান। প্রতি বছর শীত এলেই দোকানের সামনে একটি বড় সাদা কাপড়ে লাল রঙে লেখা থাকত ফুল কপির সিঙারা নলেন গুড়ের সন্দেশ। খেজুর গুড়কেই যে নলেন গুড় বলে এটা বালক জেনেছিল অনেক পরে। তাই নলেন গুড় সম্বন্ধে বালকের মনে একটি কৌতূহল বহুদিন পর্যন্ত জাগরূক ছিল। দূর দূর থেকে লোকেরা এই দোকানের সিঙারা নিয়ে যেত। মাতৃ ভাণ্ডারের সিঙারা যারা খায় নি তারা নিজেদের কেমন গরিব ভাবত। তার পাশেই ছিল ওকে রেস্টুরেন্ট। তেমন ছিরিছাঁদ ছিল না। পুরোনো টেবিল চেয়ার আর বেশির ভাগ ছেলেছোকরারাই সিনেমা দেখতে এসে ফুটানি দেখানোর জন্য বিরিয়ানি খেতে এই রেস্টুরেন্টে যেত। আর একটি রেস্টুরেন্টও ছিল –অশোকা। সিনেমা দেখতে এসে কলেজ পড়ুয়া যুবক-যুবতিরা ওই রেস্টুরেন্টের কেবিনে যেত। ওখানে পর্দার আড়ালে নাকি ফস্টিনস্টি চলত। ফস্টিনস্টি যাতে বেশিদূর না গড়ায় এজন্য পর্দার নীচের দিকটি বেশ ফাঁকা থাকত। বালক তখনও জানত না ফস্টিনস্টি ব্যাপারটা কি!

বলা যায়, কামান চৌমুহনি থেকে পোস্ট অফিস চৌমুহনী পর্যন্তই ছিল শহরের সবচেয়ে জমজমাট এলাকা। এখানে আর একটি সিনেমা হলও ছিল, নাম চিত্রকথা। লোকে তখন খুব সিনেমা দেখত। বিনোদনের প্রধান

মাধ্যমই ছিল সিনেমা। আর শীতকালে ছিল যাত্রা। কলকাতার সব নামকরা যাত্রা দল আসত। এখন যেটা লেনিন সরণি আগে নাম ছিল আখাউড়া রোড। এই রাস্তাটি সোজা গিয়ে আখাউড়াকে ছুঁয়েছিল বলে এর এই নাম। স্বাধীনতার আগে লোকে সোজাসুজি আখাউড়া যেতে পারত। স্বাধীনতার পরে বর্ডার হল। বর্ডার পেরোতে হলে পাসপোর্ট লাগে। বালক দুয়েকবার তার মায়ের সঙ্গে পাসপোর্টে বর্ডার পেরিয়ে এসেছে। একটা খাল মতো জায়গার উপর বাঁশের খুঁটির ছনের ঘর। এইটাই নাকি অফিস ঘর। এখানে পাসপোর্ট দেখাতে হয়। তারপর নাম-টাম লিখে পাসপোর্টে ছাপ দিয়ে সই নিয়ে যেতে দেওয়া হত। একটা টেবিলের দু-পাশে দুজন লোক ব্যাজার মুখে বসে থাকত। সারা মুখে বিরক্তি মেশানো। একটু খেঁকিয়ে কথা বলত – নেন, এইখানে সই করেন। তার মা টিপসই দিত। একটা চামড়ার সুটকেশ ছিল। মা সুটকেশটি বালকের মাথায় তুলে দিয়ে তার ছোট বোনটিকে কোলে নিয়ে বর্ডার পেরোত। পাকিস্তানের বর্ডারের অফিস ঘরের সামনেই ছিল একটি কয়লার স্তুপ। তার সামনে তেকাঠিতে একটি বড় দাঁড়িপাল্লা ঝুলানো। এই কয়লা কে নিত, কোথা থেকে আসত কে জানে! তখন চেকপোস্ট দিয়ে লোক কমই আসত। বেশির ভাগই চোরাই পথে আসা যাওয়া করত। বালকও একদিন চান্দুরা বর্ডার দিয়ে চোরাই পথেই এদেশে এসেছিল।

কামান চৌমুহনী থেকে পোস্টাপিস চৌমুহনি যেতে রাস্তার ডান দিকে তিনটি বড় দোকানের কথা মনে আছে। একটি দোকানের নাম শ্যামসুন্দর এণ্ড কোং। নীচে লেখা – জুয়েলার্স এণ্ড মানি লেণ্ডার্স। মানি লেণ্ডার্স মানে বালক জানত না। এটা জানত এই দোকানে সোনা রূপার গয়না বিক্রি করে আর বড় লোকেরাই শুধু এই দোকানে যায়। আর, সূর্য চৌমুনির উল্টো দিকেই ছিল দুটো বড় কাপড়ের দোকান। অমর টেক্সটাইল আর রতন টেক্সটাইল।

সূর্য চৌমুহনি থেকে যে রাস্তাটি উত্তর দিকে গেছে তার দুপাশে কোনও দোকানপাট ছিল না। ফাঁকা। রাস্তাটি দৌড়ে গিয়ে যেখানে আখাউড়া রোডের সঙ্গে মিলেছে এর বাঁ দিকে ছিল একটা জলা জায়গা। পরে জেনেছে, ওই জায়গাটিতে নাকি বড় বড় গাছ ছিল আর তাতে ছিল শকুন। তা থেকেই রাস্তাটির নাম হয়ে যায় শকুনতলা রোড। রাস্তার দুপাশে কচু গাছ আর আগাছার বাড়বাড়ন্ত। একটা ছন্নছাড়া এলাকা মনে হত। এরকম কচুগাছ আর ছোটখাটো ঝোপঝাড় মতো ছিল আরএমএস থেকে পোস্টাপিস চৌমুনি রাস্তার দুপাশেও। আরএমএস চৌমুহনির এক পাশে রীতিমত জঙ্গল ছিল। তাতে প্রচুর বাদুড় ছিল। সারাদিন কিচিমিচির করত বাদুড়গুলো। রাস্তা থেকেই বাদুড়ে গন্ধ নাকে এসে লাগত। আর একটি বাদুড়ে এলাকা ছিল বাদুড়তলীতে। প্রচুর বাদুড় ছিল সেখানেও। এই বাদুড়েরা উদ্বাস্তু হয়ে কোথায় গেছে, কে জানে!

কামান চৌমুনির দক্ষিণ দিকে যে রাস্তাটি গেছে তারও দুপাশে থামওয়ালা দোকান। তবে খুব যে বিক্রিটিক্রি হত দোকানের লোকজনের আচরণ দেখে তা মনে হত না। এক ধরনের অলস ভাব ছিল তাদের চোখেমুখে। হাত চলত ধীরেসুস্থে। কথা বলত কম এবং মৃদু স্বরে। একটু এগোলেই গোলবাজার। পোশাকি নাম মহারাজগঞ্জ বাজার। সাইনবোর্ডেই শুধু মহারাজগঞ্জ লেখা থাকত। সাধুটিলায় যখন তাদের বাড়ি ছিল সেসময়ের গোলবাজারের কথা বালকের মনে আছে। তখন তো বিদ্যুৎ ছিল না। যেখানে রিক্সা স্ট্যাণ্ড, গোটা দু-তিন রিক্সা দাঁড়িয়ে পোঁ পোঁ করে ভেঁপু বাজাত আর এর পাশেই ছিল লাকড়ির বাজার। বড় বড় কুপির আলো অথবা মশালের আলো জ্বলত।। পাহাড়ি জনজাতির মানুষেরা লাকড়ি বেচতে আসত। লাকড়ির বোঝাগুলো গোল করে বাঁধা থাকত না। চওড়া করে বাঁধা থাকত যাতে পিঠে করে বয়ে আনতে সুবিধা হয়। লাকড়ির বাজারের পাশেই আলোআঁধারির মাঝে দেউড়ির মতো কিছু একটা ছিল। সেটা এখন নেই। জ্যাকশন গেটের মতো ঐতিহাসিক স্থাপত্যকে আমরা যেমন অবিবেচক নৈপুণ্যে উধাও করে দিয়েছি তেমনি এই দেউড়িটিও উধাও হয়ে গেছে।

আখাউড়া রোডের পাশেই ছিল আখাউড়া খাল। একসময় আখাউড়া থেকে মাল বোঝাই নৌকা আসত এই খাল দিয়ে। এখন আখাউড়া খাল অস্তিত্ববিহীন ইতিহাসের সামগ্রী। উন্নয়নের নামে আমরা যে " ক্রিয়েটিভ ডেস্ট্রাকশন"-এর নতুন নতুন নজির তৈরি করছি আগামীদিনে তার ফল আমাদেরকে ভাল করেই ভুগতে হবে।

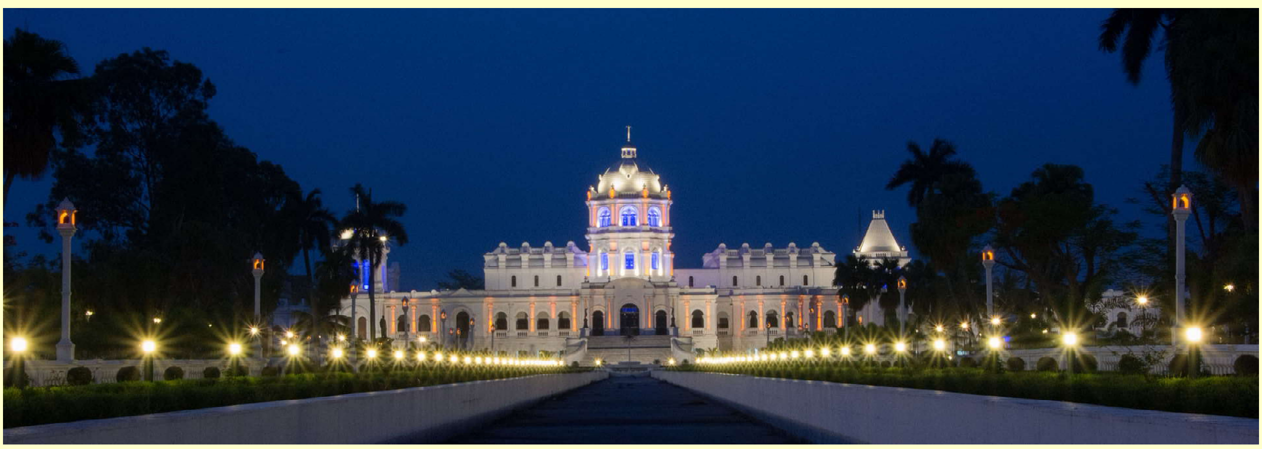

উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ

যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে

— বিমলেন্দ্র চক্রবর্তী

৭০-৭১ সাল। আমরা তখন পড়াশুনো নিয়ে ব্যস্ত। ফাইন্যাল পরীক্ষার সময়সূচি নিয়ে একদিকে যেমন চিন্তিত অন্যদিকে যুদ্ধের আনন্দ, ভয় ও আতঙ্ক। যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়েও সেদিন অনেকে ঠিকঠাক বুঝতে পারেনি একটা যুদ্ধ কতটা ভয়াবহ হতে পারে। তাই ট্যাঙ্ক, স্ট্র্যান্স, খচ্চর নিয়ে যখন লাইন করে মিলিটারিরা যেতেন তখন কারও কারও হা করে দেখার আর নতুন অভিজ্ঞতার আনন্দ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। আর একদল মানুষের ছিল উদ্বাস্তু অসহায় মানুষদের কাছ থেকে সস্তায় সোনার অলঙ্কার কেনার আনন্দ। যারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দেখেছেন, চীন-ভারত যুদ্ধ দেখেছেন, পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধ দেখেছেন এবং পড়েছেন যুদ্ধের ইতিহাস তারা ভয় ও আতঙ্কে দিন কাটাতেন। তখন যুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্যে প্রত্যেক বাড়িতে ট্রেন্স কাটা হয়েছিল। আই (I) এল (L) জেড (Z) আকৃতির। বুক অব্দি গর্ত করে এই ট্রেন্স বানানো হয়েছিল। বিদেশি যুদ্ধবিমান এদিকে আসার সংকেত পেলেই বেজে উঠতো সাইরেন। আর সাইরেন বাজলেই দৌড়ে চলে যাও ট্রেন্সে। আর রাস্তায় থাকলে, ঐ রাস্তার পাশে ড্রেনের পাড়ে উঁচু হয়ে শুয়ে পড়ো। বিপদসংকেত কেটে যাবার পর পুনরায় নিরাপদ সাইরেন বাজলে আবার স্বাভাবিক জীবন। সাধারণত রাতেই যুদ্ধটা বেশি হতো। কামানের সেল আগরতলায় যতগুলো পড়েছিল সবগুলোই প্রায় রাতের অন্ধকারে। রাতে আক্রমণের ইঙ্গিত পেলেই অথবা যুদ্ধ শুরু হতে পারে কিংবা ক্ষতি করতে পারে শহরের বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। তাই ছিল ব্ল্যাক আউট, নিষ্প্রদীপ, সব আলো নিভিয়ে গোটা শহরটাকে অন্ধকার করে রাখা। পাশাপাশি রাতে প্রয়োজনে কারফিউ জারি থাকতো। আগরতলা শহরে তখন অনেকগুলো কামান, বিভিন্ন স্থানে বসিয়ে সেখান থেকে কামান দাগা হতো। কামান থেকে যখন সেল বা গুলি ছুটতো তখন মনে হতো এক ঝাঁক পাখি যেন ছুটছে সাঁই সাঁই করে। তারপরই বিকট আওয়াজ। পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) থেকেও একইভাবে অন্ধকার রাতে জোনাকীর মতো জ্বলে মাথার উপর দিয়ে সু-উ-উ-উ-ই-সা-ই-ই-ই করে একটা আওয়াজ চলে যেত। তারপরই বিকট আওয়াজ। প্রতি সকালেই জানতে চাইতাম সবাই ঠিকঠাক আছে তো? না, মাঝে মাঝে দুঃসংবাদ

আগরতলার প্রাণকেন্দ্র কামান চৌমুহনী

আসতো, ক্ষয়ক্ষতির, মৃত্যুর। আমরা ভয়ার্ত কৌতূহল নিয়ে ছুটে গেছি সেল পড়লে কেমন ক্ষতি তা দেখার জন্যে। ১৯৭১ সালের যুদ্ধ ও উদ্বাস্তের কাহিনী দীর্ঘ উপন্যাস লিখেও শেষ করা যাবে না। তবুও কিছুটা ফিরে দেখার জন্যে আর কিছুটা অভিজ্ঞতা শেয়ার করার জন্যেই ছোটো ছোটো করে এইসব লেখা। যুদ্ধ করার জন্যে বিশেষ ওয়ারফিল্ড বা যুদ্ধক্ষেত্র যাকে বলি, সেই সীমানার পাশে বড় রাস্তার ধারে ধারে কিছু মজবুত পাকা বাঙ্কার করা হয়েছিল। বাঙ্কারটা অনেকটা মাটির নিচে গেলে ঘরের মতো। মাটির একটু উপরে ঘুলঘুলি থেকে অনেকটা বড় ছিল দু'তিনটে খোলা জানালা। উন্নতমানের আগ্নেয়াস্ত্রের মুখগুলি এই জানালা দিয়ে বাইরে রেখে ভেতরে অতন্দ্র প্রহরীর মতো জেগে থাকতো ভারতীয় সৈন্যরা। কারো বাড়ি পাঞ্জাব, কারো বাড়ি বিহার, উত্তরপ্রদেশ, ঘুম নেই, বাড়ির সাথে কোন যোগাযোগ নেই, লড়ে যাচ্ছে দেশের জন্যে। যখন যেভাবে নির্দেশ আসছে, সেভাবেই ছুঁড়ছে গুলি। ১৯৭১ সালের ভারত-পাক যুদ্ধ, আগরতলাও তখন যুদ্ধক্ষেত্র ছিল তার একমাত্র সাক্ষী এই বাঙ্কার, যা এখনও দু'একটা রয়েছে অনাদরে। যা সংরক্ষণ করে রাখা দরকার অবশ্যই নতুনদের ও পর্যটকদের দেখার জন্যে খুবই জরুরি। এর গায়ে লেখা থাকবে ইতিহাস। আখাউড়া রোড ধরে বর্ডার-এ যাবার ঠিক আগে ডানদিকে যে রাস্তা, আমরা বলি গাঙ্গাইল রোড, সেখানেই রয়েছে মস্ত বড় একটা বাঙ্কার।

যুদ্ধে দেশের লোক সাধারণত দেশেই থাকে, প্রাণ ভয়ে ঘরবাড়ি পালিয়ে বিদেশে যায় না। কিন্তু এই যুদ্ধ ছিল স্বাধীনতা লাভের জন্যে যুদ্ধ। পশ্চিম পাকিস্তানের কবল থেকে পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তিলাভের যুদ্ধ। এই যুদ্ধ ছিল বাংলাভাষাকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত করার যুদ্ধ। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের লক্ষ লক্ষ লোক গৃহহারা হয়েছিল, চরম অত্যাচার সহ্য করা ছাড়াও মৃত্যু হয়েছিল অসংখ্য মানুষের।

পোস্ট অফিস চৌমুহনিতে ছিলো এই ট্যাংক

ভারত বর্তমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশের মানুষদের আশ্রয় যেমন দিয়েছিল তেমনি দু'হাত খুলে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছিল। ত্রিপুরার মানুষ তাদের আগলে রেখেছিল মা-বাবা-ভাই-বোনদের মতো। কোন ভেদাভেদ ছিল না ধর্মে ও বর্ণে— সবাই ছিল আত্মার আত্মীয়। একদিন রাত আটটা, সাড়ে আটটায় শুরু হয়ে গেল তুমুল যুদ্ধ। হাজার হাজার গোলার শব্দে কেঁপে উঠলো চারিদিক। এভাবে চললো টানা কয়েকদিন। সেসময় রেডিওর খবর শুনতে মানুষের কি ভিড়। ভারতীয় সেনাবাহিনী ক্রমাগত এগিয়ে যাচ্ছে ভিতরে। মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে নিয়ে দখল করছে একের পর এক শহর, বন্দর এবং অবশেষে পাক বাহিনী আত্মসমর্পণ করলে জন্ম হয় বাংলাদেশের। এই যুদ্ধের শুরুতে আমরা ভয়ে সব ট্রেন্সে, মুড়ি বিস্কুট আর জল নিয়ে কাটিয়ে দেই সেইরাত। না, পরদিন সকাল থেকেই ক্রমে ক্রমে কেটে গেছে ভয়। কারণ পাকিস্তানের সৈন্যরা যুদ্ধ শুরু করার আগেই ভারতীয় সেনারা গুঁড়িয়ে দিচ্ছিল মোগরা, আখাউড়া থেকে শুরু করে ত্রিপুরা সীমান্তের কাছাকাছি পাক সেনাদের প্রায় সমস্ত বাঙ্কার, অস্ত্রশস্ত্র ও আশ্রয়স্থান। আমাদের মনে তখন খুশির জোয়ার। আগরতলা শহরে এবং আশেপাশে সৈন্যবাহিনীর অনেক কামান ছিল, তাঁবু ছিল, সৈন্য ছিল, ওদেরও তখন যুদ্ধ জয়ের আনন্দ, পরোটা, রুটি, সবজি, মস্ত গেলাসে চা, রকমারি খাবার-দাবার। আমরা তখন কামান দেখতে যেতাম, কিভাবে গুলি ছুঁড়তো জানতে চাইতাম। তখন ওরাও ভালোবেসে রুটি তরকারি, পরোটা মাঝে মাঝে আমাদের খাওয়াতেন। যুদ্ধে জয়লাভ করলে ওরা বাড়ি যাবে, স্ত্রী-পুত্র পরিজনদের সাথে আনন্দে কিছুদিন কাটাবে, এমনই একটা ছবি ভেসে উঠতো আমাদের চোখে। মাঝে মাঝে দেখতাম ওদের ভীষণ মন খারাপ। কারণ এই যুদ্ধে মারা গেছে তাদেরই অনেক প্রিয় বন্ধু যারা আর কোনদিনই বাড়ি ফিরে যাবে না।

উদাসীন সময়ের খোঁজে

— ধূর্জটী কুমার সাহা

আমি এখন একা। বছর তিনেক হল স্বামী গত হয়েছেন। এখন সময় যেন কাটতেই চায় না। এই বিশাল বাড়ির এককোণে দিনে বেশিটা সময় আমি বসে থাকি হুইল চেয়ারে আমার ঐ দো'তলার ঝুল বারান্দায়। আর্থারাইটস পঙ্গু করেছে আমায়। রাস্তায় কত পরিচিত অপরিচিত লোক চলাচল দেখি। পাড়ার পরিচিতজনের সঙ্গে হাসি দিয়ে কুশল বিনিময় হয়। তাদের চোখে একটা অবধারিত জিজ্ঞাসাও দেখতে পাই। রাস্তা থেকে ঝুল বারান্দার দূরত্ব অনেকটাই। মাঝে আমার বাগান। গলা তুলতে হবে বলে তাদের উত্তরটা মনেই রয়ে যায়। প্রশ্নটা হচ্ছে মাসিমা (অথবা দিদি) আপনি একা একা এত বড় বাড়িতে কেন থাকেন? অসুস্থ শরীর, মেয়ে যখন বিদেশে এত প্রতিষ্ঠিত-থাকতেই পারেন তাদের কাছে গিয়ে। আমি বলি; একা কোথায় গো, তোমরা তো সবাই আছো; তাছাড়া আমার কাজের লোক মুক্তার মা আমার রান্নাবান্না করে, আমাকে সবসময় দেখাশোনা করে, বাগানের পরিচর্যা, রাতেও থাকে। দিনের বেলায় বাড়ি সামলিয়ে আসে। ভট্টপুকুর বালুর চরেই তাদের বাড়ি। আমার বাড়ি থেকে দশ মিনিটের হাঁটা পথ। মাঝেমধ্যে তাদের এইরকম নানাহ প্রশ্ন দৃষ্টিতেই আবদ্ধ, দায় থাকে না উত্তর দেওয়ার, ফলে বেঁচে যাই। রাস্তা যখন দুপুরে, হয়ে পড়ে জনশূন্য চেয়ে থাকি উদাস দৃষ্টিতে। বাড়ির কোণে আমার গেটের কাছে পাশের বাড়ির বউটা তাদের বাড়ির নোংরা-অবর্জনাগুলো চুপিচুপি রেখে চলে যায়। আমার চোখ বিস্ফোরিত হয়ে উঠে। কী বলবো ভেবে পাইনা। এমনিতেই ক'দিন আগে তুমুল বৃষ্টিতে রাস্তার অবস্থা কাহিল হয়ে পড়েছে, ড্রেনের সমস্ত আবর্জনা জলের তোড়ে রাস্তার উপর গড়াগড়ি। তোমাদের নোংরাগুলো খাবার মনে করে রাস্তার কুকুরগুলো একাকার করে রাখে। ছিঃ, তোমরা কি গো!! এত এত বারণ সত্ত্বেও তোমাদের কোন হুঁশ নেই। সামনের মডার্ণ ক্লাবে এ নিয়েতো কত মিটিং হয়ে গেল। ছিঃ ছিঃ! কত আর টাকা লাগে এতে। মিউনিসিপ্যালিটির লোকেরা তো বাড়ি থেকেই এসব আবর্জনা নিয়ে যায়।

দুপুরের পুরো সময়টা আমি জানালার কাছে বসেই সময় কাটাই। ক'দিন আগের ঘূর্ণিঝড়, সাইক্লোন প্রচুর বৃষ্টি। আরো যেন কাহিল হয়ে পড়েছে এ পাড়ার বাড়ি-ঘরগুলো। অবশ্য এর চেয়েও ভয়ানক ঝড়-বৃষ্টি দেখার অভিজ্ঞতা আমার আছে। ডুবে গিয়েছিলাম সেইসব স্মৃতিতে। দেখেছি কত বড় বড় মাটির ঘর বন্যার জলে ধপাস ধপাস করে ভাঙ্গনের দৃশ্য। কি যে দুর্গতি মানুষের। মুক্তার মা বাড়ি গিয়েছিল। ঝড় চলে যাওয়ার পরও ফেরার নাম নেই। ভাবছি কি হল? ফোন এল রাত দশটায়। ব্যস্ত গলায় বলল, মাসিমা তুফানের চোটে বাড়ির টিনের চালা উড়ে গেছে। ঘরের জিনিসপত্তর ওলট-পালট। বড় বড় গাছ পড়ে বাড়ি ভেঙ্গে গেছে অনেকের। আজ আর আসতে পারছিনা। কষ্ট করে ফ্রিজের খাবার দিয়ে রাতটা চালিয়ে নিও। কাল সকালেই আসব। ভেবেছিলাম বাড়িয়ে বলছে, এই সুযোগে একটা ছুটি করে নিল। তা নিক। স্বামী বাচ্চার সঙ্গে একটা রাত কাটাতে পারবে। আমার রাতের খাবারের তেমন ঝামেলা নেই। খই, দুধ আর একটু মিষ্টি চিনি বা গুড় হলেই চলে যায়। দুধটা ঠান্ডা খেতে হবে। হুইল চেয়ারে বসে গ্যাসে গরম করা যায় না। টিভি অন্ করতেই কাজের মাসি মুক্তার মা'র খবরের সত্যতা প্রমাণিত হল। আগরতলার আশপাশ, শহর ভেসে গেছে। রাজ্যের সব জেলাই বিধ্বস্ত। পুরনো সব গাছ শিকড় উপড়ে পড়ে আছে রাস্তায়। আমার যেমন বহু সাইক্লোন, তুফান, বন্যার স্মৃতি আছে ওদের ছিল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। ঝড়ের দাপট তেমন না থাকলেও কেন ওভাবে ধরাশায়ী হল ওদের। মাটির সঙ্গে শিকড়ের টান কখন যেন আলাদা হয়ে গেছে টের পায়নি। গাছপালার পরিণতি দেখে কখন একটা ভয় ঘিরে ধরলো আমায়। আমিও তো এখন একটা ঐ গাছেরই মতো। আমারও তো আলগা হয়ে গেছে শিকড়। স্বামী নেই। একমাত্র মেয়ে বিয়ে হয়ে আমেরিকায় সিয়াটেলে। নাতি-নাতনিদের গলা শুনতেই পাই ফোনের মাধ্যমে। দৃষ্টি দিয়েও ছুঁতে পারিনা ওদের আনন্দ-বেদনা, উচ্ছাস। শিকড় আমারও উদাসীন হয়ে গেছে। সামান্য কোনো ঘটনাই হয়তো আমাকে উপড়ে ফেলবে।

আমাদের এই বাড়িটা কর্তা কিনেছিলেন খুব শখ করে। কল্পনায় প্ল্যান তৈরি করতেন বাড়ির। বলতেন একটা ঝুল বারান্দা থাকবে, থাকবে কোমর সমান নকশা করা রেলিং। ছাদে যাওয়ার লোহার সিঁড়ি, খড়খড়ি দেওয়া জানালা, এরকম আরও কত কী। যখন বাড়ির প্ল্যান আমায় বলতেন, উৎসাহ ভরে ইন্ধন জোগাতাম। প্লট দেখাতে নিয়ে কর্তা বলেছিল: "বাসস্থান বলতে এরকম জায়গাকেই বোঝায়। শহর থেকে খুবই কাছে। আবার আছে গ্রামেরও জলছাপ। আশপাশের গাছপালাগুলো দেখো, খালবিল, বাড়ির সামনে বিরাট দু-তিনটে পুকুর। পুকুর তো নয় যেন দীঘি। নাম সর্দার পুকুর। আশপাশের কয়েকটা গ্রামের মানুষের প্রাণের আস্থানা, জলের ঠিকানা। স্নান করা, সাঁতার কাটা, বাসন মাজা, সমস্ত মাঙ্গলিক কাজ। বাড়ির পেছনেও বিরাট জলখেলা। পুকুর-ডোবার ছড়াছড়ি, বিস্তর ধানক্ষেত। জলচর প্রাণীদের প্রাণখোলা আনাগোনা। মাঝে বিস্তর খেলার মাঠ। সকাল-বিকালে ছোট-বড়দের দাপিয়ে খেলা সেই জল্লার মাঠ। গরু বাছুরের অবাধ বিচরণ। সজীব গাছপালা, ঘাস সতেজ। এর প্রভাবে তোমাদের মনও হবে নির্ভার শুদ্ধ, এমন গ্রামটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি।" তারপর কয়েক বছর ঘুরতে না ঘুরতেই ক্লাব ও পাড়াপড়শীদের উদ্যোগে রাস্তাঘাট প্রশস্ত হল, হল পিচঢালা পথ। ততদিনে এলাকা থেকে গ্রাম গ্রাম ভাবটাও উধাও হতে শুরু করেছে। কল্পনায় ভেসে উঠে সর্দার পুকুরের চারপাশ থাকবে সবুজ গাছপালা, চাতাল বাঁধানো ঘাট। হাওয়ায় জুড়িয়ে যাবে প্রাণ- জলচর প্রাণীদের খেলায়, শাপলা-শালুকে মনে দেবে দোলা। অবশ্য আমার বাড়িটারও আজ এই অবস্থা। বাড়ির সামনের বাগানটা এখন আর আগেকার মতো নেই। একসময় ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা লুকিয়ে লুকিয়ে ফলফুল পাড়তে আসতো আমাদের এই বাগানে। আড়াল থেকে তাদের মিষ্টি দুষ্টুমি দেখতাম। এখন আর কেউ আসেনা। আমি ঐ ছোটগুলোকে এখনও কল্পনায় নিয়ে আসি ঐ বুজিয়ে ফেলা পুকুর-দীঘি জলাশয়েরই মতো। প্রতিটি বাড়িই আজ ভাগ ভাগ হয়ে ঘিঞ্জি ঘিঞ্জি রূপ। মন খারাপ হয়ে যায়। রাস্তার ওপারে দত্তদের সেই সর্দার পুকুর, যা ছিল এ পাড়ার প্রাণ। বাঁধানো ঘাটের সিঁড়িতে সবুজ গাছপালা, অল্প অল্প ঢেউ, পাখিদের কলকাকলি, এতোল-বেতোল হাওয়া আজ শুধু কল্পনাতেই রয়ে গেল। বুজিয়ে ফেলে উঠেছে বেশ কয়েকটা হাইরাইজ ফ্ল্যাট বাড়ি। 'জল্লার মাঠ', মাঠের চারিদিকে দীঘি, পুকুর, নালা, খাল-বিল বুজিয়ে সরকারী উদ্যোগে গড়ে উঠেছে 'নাগেরজলা' বাস স্ট্যান্ড। পাশ দিয়ে ঘেঁষে উড়াল পুল। দিনের শুরুটা হয় গাড়ির ধোঁয়া, ধুলাবালি, চিৎকার চেচামেচি, হৈ-হুল্লা-হট্টগোল দিয়ে।

আমাদের পাড়াটাও তাই আগের মতো আর সুন্দর নেই। আমাদের দো-তলা বাড়ির সামনেই উঠেছে দশতলা ফ্ল্যাট বাড়ি। দৃষ্টিপথ হয়েছে সংক্ষিপ্ত। আকাশে পাক খাওয়া

চিলের পুরো বৃত্তটা দেখতে পাইনা। অস্তরাগ ছোঁয়া মেঘগুলো এখন অনেকটাই চোখের আড়ালে। ফ্ল্যাট বাড়ির দেয়াল ডিঙ্গিয়ে যখন উঠে আসে চাঁদ, বড়ো মুহ্যমান দেখায়।

তবে ফ্ল্যাট বাড়ি হওয়ার একটা ভালো দিকও আছে। নতুন মানুষ এসেছে কত। তাদের ধরন-ধারণ এক একরকম। পাড়ায় যেহেতু নতুন, একটু সিঁটিয়ে থাকে। চেহারায় প্রতিভাত হয়ে ছেড়ে আসা বসতের বিষাদ। ক্লাবের গা ঘেঁষে যে ফ্ল্যাট বাড়িটা এদের মধ্যে এক ইয়ং দম্পতিকে আমার খুব পছন্দ হয়। বর-বউ দু'জনেই চাকরি করে। অফিসে বেরোনোর সময় মেয়েটির এবং ছেলেটির একটা লক্ষ্য করার মতো অভ্যাস আছে। ফ্ল্যাট বাড়ির গেট থেকে বেরিয়ে ক্লাবের গা ঘেঁষে মিউনিসিপ্যালিটির চাতাল বাঁধানো জলের টেপ। সময় ধরে জল আসে, জল যায়। পাড়ার অনেক লোকেরা ব্যবহার করে। কলের টেপ বন্ধ করার কথা কারোরই খেয়ালে থাকেনা। মেয়েটি কিন্তু অফিসের জন্য বেরিয়ে প্রথমেই ওই কাজটি করে। সেই সময় ওর গার্ডার বাঁধা চুল পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়ে সামনে। ব্যাগ কাঁধ থেকে নেমে কনুয়ের ভাঁজে ঝোলে। সব সামলে নিচ হয়ে কলের প্যাচ বন্ধ করে সে। যেন জল সিঞ্চন করল এলাকার অবশিষ্ট গাছপালায়। যার কিছুটা আমার শিকড়েও এস পড়ে। ছুটির দিন অথবা মেয়েটি যেদিন অফিসে যায় না জল পড়েই যায় কল থেকে। আমার আড়ষ্ট পা দুটোর গভীরে চনমন করে উঠে অজ্ঞাত কোন স্নায়ু, যা স্মৃতির মতোই নিরুপায়। মেয়েটি প্রতিদিন অফিসে না বেরোনো অবধি আমার স্বস্তি নেই। রোজই আমি এই সময়টা মেয়েটার জন্য উন্মুখ হয়ে বসে থাকি। ছেলেটিও রোজকার অফিসের সময় নিত্যদিনের ছন্দে হাতে সেই কালো পলিথিনের ব্যাগ নিয়ে ক্লাবের পেছন দিয়ে যে রাস্তাটা চলে গেছে নাগেরজলা বাস স্ট্যান্ডের দিকে সেটা ধরে এগিয়ে যায়। হয়তো বাড়ির জমা করা নোংরা আর্বজনাগুলো মিউনিসিপ্যালিটির নির্দিষ্ট ড্রামে রেখে দিয়ে চলে যায় বাস ধরে অফিসে। যতদূর দেখা যায় দেখেছি নির্দিষ্ট একটা তফাৎ রয়েই যায় তাদের দু'জনের মাঝে। সন্ধেবেলা কিন্তু এরা বাড়ি ফেরে একসঙ্গে, হেসে হেসে গল্প করতে করতে।

হ্যাঁ, আজও মেয়েটা ও ছেলেটা বেরিয়েছে ফ্ল্যাটের গেট দিয়ে। নিচু হয়ে বন্ধ করছে কলের টেপটা। তারপর ছেলেটাও নির্বিকারভাবে চলছে অফিসে, হাতে সেই কালো পলিথিনের ব্যাগ। কপালের মাঝে সকালের রোদে ঘেমে উঠেছে তাদের মুখ। মনে মনে বলে উঠি, সাবধানে যেও তোমরা। দুর্গা, দুর্গা। আমার সঙ্গে সঙ্গে আরও কারা যেন বলে উঠল একই কথা। কারা? পরখ করতে এবার উচ্চারণ করে মঙ্গল কামনা করি। এতদিন ধরে আমার এই উদাসীন সময়ে আমি খুঁজে ছিলুম তোমাদেরকেই। আবারও কোরাস। হবে, হবে। এ পাড়ার সব মানুষেরই আচার-আচরণ হবে তোমাদেরই মতো। এবার চিনতে পারি ওদের কণ্ঠস্বর। এরা হচ্ছে আমাদের এলাকার সেইসব লুপ্ত পুকুর, বিল, ডোবা আর বিস্তর মাঠ। বন্ধ দরজার ভিতর বোবাদেরও অনেক কথা থাকে বুঝতে পারি। সেটুকুও। যা নিজের কানকেও যেন বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।

চল্‌টা যেন থাকে

— প্রদীপ কুমার ভৌমিক

মেঠো পথে চলন
চওড়া নদী সাঁকোতে পারাপার
ছোট বড় সবার হত দরকার
সাবধানতার এবং ভালবাসার
জোরে মন আবদ্ধ ছিল চমৎকার।
পথ হল চওড়া নদী হল সরু
সাঁকোর স্থলে গড়া হল সেতু
মসৃণ চলাচল হয়েছে শুরু।
উন্নত জীবন যাপন সব গামে গ্রামে
স্মার্টফোন সকলের হাতে
ফেইসবুক, হোয়াটসঅ্যাপে পাওয়া
গেল স্থান লিখতে গল্প, কবিতা
খবরা খবর
ভালমন্দ দশ দেশের
সশরীরে প্রণাম, শুভেচ্ছা
চলে গেল দূরে।
আপষোশ থেকে যায়
দেখা পাই নি বলে।
সাক্ষাৎকার ঘন হলে
আশীর্বাদে মন ভরে
আবেদন সশরীরে প্রণাম, ভক্তি
সমাজের চল্‌টা যেন থাকে।

মানুষ

— গৌরভ দত্ত

আমি আমার স্বরূপে মানুষ,
আমার ফর্সা, কালো বর্ণের আড়ালে, মিথ্যে গুণের মুখোশ,
আমি প্রতিহিংসাই ভালোবাসি,
অর্থ, খ্যাতি, লোভ, লালসার মোহই আমার অট্টহাসি,
আমি নির্দ্বিধায় স্বার্থ দেখি,
সাদার খবর জানান দিয়ে, নিজেই আমি কালো শিখি,
আমি অন্ধকারে সত্যি আঁকি,
বুক ভরা হিংসা নিয়ে, যৌবনকে আমি বৃদ্ধ ডাকি,
আমি ভুলের বোঝা পায়ে রাখি,
নিত্যদিনের দোষারোপগুলো দু-হাত ঝেড়ে ঘুমিয়ে থাকি
আমি মানুষ।

গর্বের ক্লাব

— রাজেশ ভদ্র

মোদের গর্ব মোদের আশা
মডার্ণ ক্লাবের সদস্য হওয়া,
ছোট থেকে দেখে ফেরা
জল জমি থেকে পাকা বাসা।
বাঁশের মাচার উপর ক্যারাম খেলা,
তার নিচে জলের খেলা
এটা ছিল আমাদের কৈশোর বেলা।

তিন দিকে তিন পুকুর
জলে ভরতো বর্ষার
বুক সমান জল হতো
কখনো নৌকা আসতো।
পুকুরেতে পূজা হতো
ভেলা বেয়ে ঠাকুর যেত,
অমৃত সিং নাইট হলো
সারা ত্রিপুরায় নাম কুড়ালো।

একাঙ্ক নাটকে সেরা হলো
সংস্কৃতি জগতে নাম জুড়ালো।
ফুটবল - এ ইতিহাস করলো
গোল্ড কাপে জয়ী হলো।
বাঁশের মাচায় যাত্রা শুরু
শহর দক্ষিণের এই মহাগুরু,
আলোর রোশনাই আজ দেখলাম,
গর্বে বুক ফুলালাম।

স্মরণে দিলীপ দা...

— প্রণব পোদ্দার

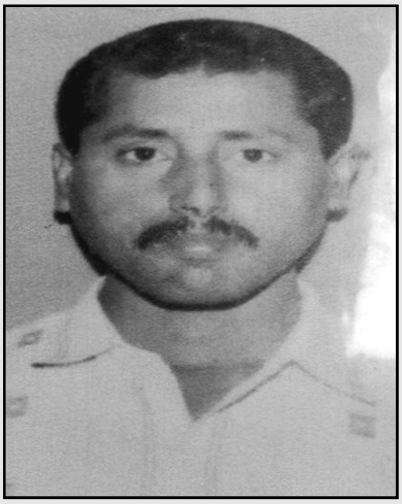

প্রয়াত দিলীপ দে

সেই আশির দশকের শেষ প্রান্ত থেকে মডার্ণ ক্লাবের আশপাশে আনাগোনা। প্রথমে ছিলাম দুই বন্ধু। তারপর বাড়তে বাড়তে বন্ধুর সংখ্যা বিশ থেকে পঁচিশ জনে দাঁড়ায়। প্রতিদিন বিকেল হলেই সবাই মিলে আড্ডা দিতাম। এখনও মনে পড়ে বাপুজী স্কুলে যাবার রোডে স্বর্গীয় কার্তিক চক্রবর্তীর বাড়ির সীমানা ঘেঁষে বন্ধুরা বসতাম। একসাথে এতোজন উঠতি ছেলের আড্ডা দেখে একেকজন একেকরকম মন্তব্যও করতেন। বড়দের মধ্যেও আমাদের আড্ডা নিয়ে ভালোমন্দ মিশিয়ে আলোচনা যে হতো বুঝতে পারতাম। এমনই করে চলছিলো দিন।

নব্বইয়ের দশকের সবেমাত্র শুরু। তখন মডার্ণ ক্লাবের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় ছিলেন দিলীপ দে। দিলীপদা আমাদের প্রত্যেককে ক্লাবের মেম্বার করতে উঠেপড়ে লাগেন। তখন আগরতলা শহরের অন্যতম নামীদামী ক্লাব আমাদের মডার্ণ ক্লাব। দিলীপদা'র আন্তরিক উদ্যোগে আমরা সবাই ক্লাবের মেম্বারশিপ গ্রহণ করি। সেই থেকে আজ পর্যন্ত কোনো না কোনো বন্ধু ক্লাবের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে আসছেন। এই কাজের মধ্য দিয়ে এলাকার উন্নয়নের সাক্ষীও আমরা। এখন ক্লাবের সব আছে। কিন্তু নেই দিলীপদা। দিলীপদা'র মতো প্রাণচঞ্চল, কর্মঠ ও প্রিয় মানুষটিকে আমরা বহু আগেই হারিয়েছি। ক্লাব আজ মহা সমারোহে প্রতিষ্ঠার ষাটতম বর্ষ উদ্‌যাপন করছে। কিন্তু দিলীপদা'র শূন্য আসন পূরণ হয়নি।

দীর্ঘ এই সময়ের মধ্যে ক্লাবের অনেক সক্রিয় সদস্যই প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে ভগবানের চরণে জায়গা নিয়েছেন। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য স্বপনদা, মলয়দা, বিশুদা আরও অনেকে। ক্লাবের ষাটতম বর্ষে দাঁড়িয়ে তাদের কথা খুব মনে পড়ছে। এক সময়ের বাঁশের তৈরি ক্লাবঘর আজ ত্রিতল ভবনে উন্নীত হয়েছে। সবার প্রচেষ্টায় আরও উন্নত হবে মডার্ণ ক্লাব। সৃষ্টি থেকে আজ পর্যন্ত দিলীপদা'সহ যারা এজন্য অবদান রেখে গেছেন তারা আজীবন আমাদের মনের মণিকোঠায় থেকে যাবেন। পরিশেষে বলতে চাই—

"ফুরায় যা তা ফুরায় শুধু চোখে,
অন্ধকারের পেরিয়ে দুয়ার যায় চলে আলোকে"

আমার পাড়া
সুন্দর পাড়া

— সঞ্জয় দত্ত

আবর্জনার সমস্যা পরিবেশের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য হুমকির সৃষ্টি করে, সামগ্রিক দূষণ জনস্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে। যদিও এটি একটি বিশ্বব্যাপী সমস্যা, স্থানীয় পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করে বাস্তবসম্মত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তার সুষ্ঠু নিরসন অপরিহার্য বর্তমান সময়ে।

আবর্জনা সমস্যার— মূল চ্যালেঞ্জ হচ্ছে অতিরিক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি। দ্রুত নগরায়ন, মানুষের সচেতনতার অভাব প্রভৃতি। অপর্যাপ্ত বর্জ্য অবৈজ্ঞানিকভাবে নিষ্পত্তির চেষ্টার ফলে আবর্জনা, মাটি দূষণ এবং জলের উৎসের দূষণের দিকে পরিচালিত করে। দক্ষ পুনর্ব্যবহারযোগ্য সুবিধার অভাব সমস্যাটিকে আরো বাড়িয়ে তোলে। যার ফলে অ-বায়োডিগ্রেডেবল বর্জ্যের পরিমাণ বাড়তে থাকে। প্রত্যেক এলাকায় নাগরিকদের তাদের বর্জ্য বাছাই এবং পুনর্ব্যবহার করতে উৎসাহিত করার জন্য এলাকাভিত্তিক পুনর্ব্যবহার কেন্দ্র স্থাপন করা এই মুহূর্তে খুবই প্রয়োজনীয়। সেক্ষেত্রে পুনর্ব্যবহারযোগ্য এবং সঠিক বর্জ্য নিষ্পত্তির সুবিধা সম্পর্কে এলাকার প্রতিটি মানুষকে শিক্ষিত করার জন্য সচেতনতামূলক কর্মসূচি নেওয়া উচিত। অ-পুনর্ব্যবহারযোগ্য বর্জ্যকে শক্তিতে রূপান্তর করতে, ল্যান্ডফিল (Landfill) নির্ভরতা হ্রাস করার জন্য স্থানীয় বর্জ্যকে শক্তি প্ল্যান্ট (Power Plant)-এ প্রয়োগ করতে হবে। যদিও সেটা কোন এলাকার দ্বারা সম্ভব না, তা করতে হবে সরকারের বিভিন্ন দফতরের প্রচেষ্টার মাধ্যমে।

আবর্জনা সংগ্রহের প্রক্রিয়াগুলিতে বিজ্ঞান প্রযুক্তির ব্যবহার করতে হবে। সেন্সর সজ্জিত বিন এবং দক্ষ বর্জ্য সংগ্রহ রুটের মত প্রযুক্তি ব্যবহার করা অবশ্যই দরকার। এই সংগ্রহের সময়সূচি তথ্য দিয়ে এলাকাবাসীদের ক্ষমতায়ন করতে প্রয়োজন মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করতে হবে এবং দায়িত্বশীল বর্জন নিষ্পত্তিকে উৎসাহিত করতে হবে। অবৈধ ডাম্পিং এবং অনুপযুক্ত বর্জ্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজনে জরিমানাসহ কঠোর বর্জ্য নিষ্কাশন প্রবিধান প্রয়োগ করতে হবে।

এই তো গেল সর্বজনীন কথাবার্তা। এবার আসা যাক আমাদের জন্মস্থান তথা আমাদের এলাকার সমস্যা নিয়ে

আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থানে ফেলুন

কিছু কথা এবং তার থেকে উত্তরণের পথ বের করা। যখন আমাদের এলাকার মেইন রোড বর্তমান রাস্তা থেকে সরু ছিল এবং ড্রেইনও সরু ছিল তখনো আমাদের ছোটবেলায় আমাদের এত বর্জ্য নিয়ে সমস্যায় পড়তে হয়নি। যা বর্তমান সময়ে আমরা লক্ষ্য করছি। ১৯৮৯-৯০ সালে সদ্য প্রয়াত জননেতা সুরজিৎ দত্ত মহোদয়ের প্রচেষ্টায় এবং আমাদের মডার্ন ক্লাবের সহযোগিতায় এলাকার রাস্তা চওড়া করে নতুনভাবে নির্মিত হয়েছিল। পাশাপাশি দু'পাশের ড্রেইনও চওড়া হয়েছিল। এই কথা বলাটা প্রাসঙ্গিক এই কারণে যে, এলাকার রাস্তা চওড়া হওয়া সত্ত্বেও বিগত কয়েক বছর ধরে রাস্তার যত্রতত্র আবর্জনা ফেলা এলাকার একাংশ নাগরিকদের অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। নাগরিকদের ভাবা উচিত তারা যেভাবে তাদের নিজ নিজ বাড়ি ঘর সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখতে সদা প্রস্তুত থাকে সেইভাবে এলাকার রাস্তাও নিজের মনে করতে হবে। এবং নিজের বাড়ির বর্জ্য পদার্থ নিজেদের বাড়িতেই সুনির্দিষ্ট বিন (পাত্র)-এ রাখতে হবে এবং সপ্তাহের রুটিন হিসাবে মিউনিসিপ্যালটির বর্জ্য পদার্থ সংগ্রাহকদের নিয়ে যেতে সাহায্য করতে হবে। নিজেদের বাড়িঘর সুন্দর রেখে এলাকার রাস্তার ড্রেইনের পাশে যত্রতত্র আবর্জনা ফেলে অন্য মানুষের অসুবিধা সৃষ্টি করা বা এলাকার পরিবেশ দূষিত করার অধিকার কারোর নেই। বর্তমান সময়ের মানুষ যথেষ্টই শিক্ষিত এবং সংবেদনশীল হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে মানুষ এখন এতটাই আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে যে, তাদের সমাজ বা

অন্যদের নিয়ে ভাবার অবকাশ পায় না। ভুলে গেলে চলবে না এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হচ্ছে মানবজাতি। আমরা প্রত্যেকে একে অপরের পরিপূরক হয়ে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কাটানো উচিত। আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে বেরিয়ে এসে সামাজিক জীব হিসাবে নিজেকে ভাবতে হবে। এক্ষেত্রে স্বামীজির একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করছি। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন— 'সমাজের জন্য কিছু করার মধ্য দিয়েই সমাজ থেকে কিছু পাওয়ার অধিকার জন্মে।' স্বামীজি বলেছিলেন— 'Unselfishmen in God'. আমরা দেখতে পাই এলাকার প্রতি বাড়িতেই কোন না কোন সময় ধর্মাচরণ হয়, যার যার ইষ্টদেবতার ধূমধাম করে পূজা নিবেদন করা হয় ভগবানের আশীর্বাদ পাবার আশায়, কিন্তু ঐ সমস্ত পূজা অনুষ্ঠান সেরে রাতের অন্ধকারে বাড়ির বর্জ্য/আবর্জনা স্বার্থপরের মত রাস্তার ধারে ফেলে পথচলতি অন্য মানুষদের এবং এলাকাবাসীর অসুবিধা সৃষ্টি করা হত। এইরকম মানুষের দ্বারা কখনোই অন্য যা-ই হোক ভগবান প্রাপ্তি হবে না। আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের দেশ ধীরে ধীরে উন্নতশীল দেশ থেকে উন্নততর দেশ হওয়ার দিকে এগোচ্ছে। আমাদের শহর অনেক বছর আগেই স্মার্টসিটি হিসাবে পরিগণিত হয়েছে এবং বর্তমানে তার কাজও শুরু হয়েছে। এ এম সি তার সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়ে শহর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বাস্তবিকভাবে বলতে হয় রাষ্ট্র ব্যবস্থার সদ্ইচ্ছার দ্বারা সবকিছুতে সফলতা আসে না, তাতে প্রয়োজন মানুষের তথা প্রতিটি এলাকার, প্রতিটি শহরের নাগরিকদের সচেতনতা, মূল্যবোধ, আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে বেরিয়ে আসা এবং এলাকার দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে নিজেকে ভাবা এবং এলাকা তথা শহরের উন্নয়নে নিজেকে শামিল করা।

বিগত এক দশক ধরে আমাদের এলাকার আবর্জনা বিষয় নিয়ে ক্লাবগুলি অনেক উদ্যোগ নিয়েছে, অনেক সভা করা হয়েছে, অনেক সচেতনতামূলক ফ্ল্যাক্স/পোস্টার লাগানো হয়েছে। অনেক সচেতনতামলূক র‍্যালিও করা হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও এলাকাবাসীর সম্বিত ফিরেনি। যার ফলস্বরূপ প্রতিদিনই সকালবেলা প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে রাস্তার যত্রতত্র বর্জ্য পদার্থ আমি বা আমরা দেখতে পাই যা অবশ্যই আমার মনকে পীড়া দেয়। তুলনামূলক বিশ্লেষণ যদি করি আমাদের এলাকায় আগের তুলনায় বর্তমানে শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা অনেক বেশি (কাউকে ছোট না করেই বলছি) কিন্তু এই কি শিক্ষা, যে শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আমি শুধু আমিতেই থাকবো এলাকার মানুষের কথা ভাববো না? আমার পাশের বাড়ির মানুষের কথা ভাববো না? আমার শহরের মানুষের কথা ভাববো না? আমার বাড়ির আনন্দ অনুষ্ঠানের বা ধর্মাচরণের আহার বা প্রসাদ গ্রহণের উচ্ছিষ্ট আমি রাস্তার ধারে ফেলে অন্যের ক্ষতি করব! এই জাতীয় শিক্ষায় শিক্ষিত লোকদের আমি ব্যক্তিগতভাবে ধিক্কার জানাই এবং আমি তাদের খুবই নিম্নশ্রেণির মানুষ বলেই মনে করি। লেখার শুরুতেই আমি বর্জ্য নিষ্কাশনের ব্যবস্থা, সচেতনতা বৃদ্ধি, জরিমানা, আইন প্রয়োগ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি।

আসুন আমরা সবাই মিলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই যে, আমরা সবাই মিলে আমাদের এলাকাকে পরিষ্কার রাখবই। এলাকাভিত্তিকভাবে আবর্জনা সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য একটি বহুমুখী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এলাকার সমস্ত শ্রেণির মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে তার প্রযুক্তিগত সমাধানে পথ বের আমাদের করতেই হবে। এলাকার নাগরিকদের মধ্যে দায়িত্ববোধ জাগিয়ে আমরা একটি পরিচ্ছন্ন পরিবেশ তৈরি করাতে অবদান রাখতেই পারি। এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নতির জন্য একটি মডেল তৈরি করতে পারি যা আগামীদিনে আগরতলা শহরের মধ্যে আমাদের এলাকা শ্রেষ্ঠত্বের স্থান পাবে এবং তাতে অবশ্যই কোন রাজনীতির পদচারণ থাকবে না।

পরিশেষে একটি কথাই বলতে চাই এই বর্জ্য সমস্যার দূরীকরণের দায়িত্ব শুধু কয়েকটা ক্লাব এবং কিছু ব্যক্তিবিশেষের নয়। তাকে গণআন্দোলনের রূপ দিতে হবে। লক্ষ্য একটাই— যে কোনও কিছুর মূল্যে আমি আমার এলাকা পরিচ্ছন্ন রাখবই এবং বর্জ্য নিষ্কাশনে এ এম সি কে সহযোগিতা করব এবং প্রতিটি এলাকাবাসী নিজেদের ঘরবাড়ির মত এলাকার রাস্তা/ড্রেইনকেও নিজের ভাববো, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবো।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাস্তাঘাট এলাকার মানুষের সুন্দর ও চিন্তাশীল মননের বার্তা বহন করে।

এমন পাড়া চাই না

প্রিয় মডার্ণ ক্লাব

— রাজু ঘোষ

ক্লাবের ২০২৩ সালে পূজা মন্ডপ

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় যেখানে সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত এবং বেশিরভাগ মানুষ যখন আত্মকেন্দ্রিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন, এখন আর মানুষ নিজেকে বা নিজের পরিবার ছাড়া কিছুই ভাবতে পারছেন না। এর ফলে ধীরে ধীরে মানুষ সমাজ বিচ্ছিন্ন এক যান্ত্রিক জীব হয়ে উঠছেন। সেখানে আছে Internet, Face book, Whatsapp সহ আরওনানা রকম সামাজিক যোগাযোগের উপকরণও বর্তমানে আমরা এই সব উপকরণ ও নানারকম ভার্চুয়েল যোগাযোগের মাধ্যম ছাড়া কিছুই ভাবতে পারছিনা।

সুখে-দুঃখে একে অপরের পাশে দাঁড়াতে ভুলে গেছি আমরা। শুধুমাত্র সামাজিক মাধ্যমে একটা পোস্ট শেয়ার করে আমাদের সকল সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সমাপন করছি। আমরা হারিয়েছি বন্ধুদের মধ্যে গল্প, আড্ডা, কবিতা বলা, শুভেচ্ছা বিনিময়সহ বিভিন্ন ভাবের আদান-প্রদান।

আমাদের এই ছোট্ট শহর আগরতলা যার পরিধি আগে খুব বেশি বিস্তৃত ছিল না। মূল শহর ছিল ছোট পরিসরে। কোন একসময় আমরা ভাবতে পারিনি আগরতলায় বড় বড় উঁচু উঁচু ফ্ল্যাট বাড়ি তৈরি হবে। এই শহরে সেই শুরু থেকে কিছু কিছু ক্লাবে ও কিছু সামাজিক সংগঠন তাদের কর্মযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে বর্তমানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। এদের মধ্যে একটি ক্লাব হচ্ছে আমাদের প্রিয় মডার্ণ ক্লাব। এই ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে এখনো পর্যন্ত সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের একসঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন সেবামূলক কাজ করে যাচ্ছে।

এই প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সময়ে মেধাবী গরিব ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বই, খাতা, কলম বিতরণ, সমাজের দুঃস্থ মানুষদের মধ্যে বছরের বিভিন্ন সময় বস্ত্র বিতরণ এবং কম্বল বিতরণ করে চলছে। তারা বিভিন্ন সময় এলাকার বিভিন্ন বয়স্ক মানুষ তথা সকলের জন্য স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করে থাকেন। এবং রক্তদান শিবিরের মাধ্যমে রক্তের যোগান দেন। কিছুকাল পূর্বে যখন সারা পৃথিবী Covid-19-এ আক্রান্ত এবং বিশ্বে যখন এই রোগ মহামারীর রূপ নিতে থাকে এবং প্রতিটি মানুষ যখন গৃহবন্দি সেই সময় এই প্রতিষ্ঠানের নির্ভীক স্বেচ্ছাসেবকরা মানুষের সহায়তায় নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে মানুষের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। এলাকায় কারো বাড়িতে জল নেই, খাবার নেই, ঔষধ নেই, মানুষের বাড়িতে খাবার পৌঁছে দেওয়া, জলের ব্যবস্থা করে দেওয়া ইত্যাদি কাজ নিরলসভাবে করে গেছিলেন।

এই প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে যে অঙ্গীকার করে মানুষ তথা সমাজের কল্যাণ করার সংকল্প নিয়ে অগ্রসর হয়েছিল, আমরা আশা করি আপনারা আগামীদিনেও আপনাদের এই গঠনমূলক কর্মযজ্ঞ চালিয়ে যাবেন এবং আগামী প্রজন্মকে কাজের প্রেরণা যোগাবেন।

আজকে আমরা যখন আমাদের এই সামাজিক সংগঠন তথা মডার্ণ ক্লাব এর ৬০ বছর বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছি তখন বিশেষভাবে স্মরণ করতে হবে তাঁদের কথা তাঁরা নাকি আজ থেকে বহু বছর আগে মানুষের জন্য, সমাজের কল্যাণের জন্য এই সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। কোন এক সময়ের তরুণ আজকে প্রবীণ বা বৃদ্ধ কিন্তু তাঁরা যখন তরুণ ছিলেন তাঁদের সৎ চিন্তা, মানবিক মূল্যবোধ সমাজ ও দেশের নাগরিকদের সুস্থ ও ভালো রাখার মানসিকতা আজও আমাদেরকে প্রেরণা যোগায়। আমি আমার এই সংক্ষিপ্ত লেখার মাধ্যমে সকল প্রবীণদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি ও আপনাদের এই সৎ চিন্তা ও মূল্যবোধ এবং সমাজের উপকার করার মানসিকতাকে আগামীদিনে বহন করে নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করছি। সকলে ভালো থাকবেন ও সুস্থ থাকবেন।

মডার্ণ ক্লাবের সেকাল ও একাল

— প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত (বাবলা)

মডার্ণ ক্লাব এই দুটি শব্দ বলতে বোঝায় একটি আধুনিক মঞ্চ বা সংঘ। মডার্ণ ক্লাবের সেকাল বলতে জলাশয়ের উপর তৈরী ছন ও বাঁশের ঘর এবং একালের মডার্ণ ক্লাব হল আর.সি.সি. দিয়ে তৈরী ত্রিতল পাকাবাড়ি। সেকালের মডার্ণ ক্লাবের দুর্গাপূজা হত বাঁশ, টিন দিয়ে তৈরী একটি মন্দিরে। ক্লাব সদস্য দ্বারা দুর্গা প্রতিমা তৈরী হতো। আর একালের মন্দির তৈরী হয় কাঠ, প্লাস্টিক, থার্মোকল দ্বারা এবং বহিররাজ্যের মূর্তি শিল্পী দ্বারা এবং চিন্ময়ীরূপে। সেকালের অনেক ক্লাব সদস্য ছিল আন্তরিক, বিনয়ী। একালের ক্লাব সদস্যরা কঠোর পরিশ্রমী। সেকালের অনেক ক্লাব সদস্য গত হয়েছেন। একালের অনেক সদস্য বয়সের ভারে নতজানু। সেকালের মডার্ণ ক্লাব নাটক ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান থেকে প্রচুর পুরস্কার জিতে এনেছে। আর একালের মডার্ণ ক্লাব নিজেরা বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান করে থাকে। সেকালে মডার্ণ ক্লাব তৈরী হয়েছিল কয়েকজন সদস্য দ্বারা। একালের মডার্ণ ক্লাবের সদস্য শতকের উপর।

ক্লাবে স্বামী বিবেকানন্দ জন্ম জয়ন্তী পালন

কোভিডের সময় ক্লাবের পক্ষ থেকে দুঃস্থদের আর্থিক সাহায্য করা হয়

ক্লাবে দাবার আসর

কোভিডের সময় এলাকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখেন ক্লাবের ছেলেরা

পুরুষ মাগে নারীর প্রণয়, নারী মাগে টাকা

— নির্মল অধিকারী

চলতি জগতের বাস্তব চিত্র। এ শব্দমালায় বর্তমান সময়ের সঠিক চিত্র ফুটে উঠেছে। কবিগুরু রীন্দ্রনাথও এ মায়াময় জগতের চিত্র উপলব্ধি করে লিখেছিলেন, 'নারীর ললিত লোভম লীলায় এখনি কেন এ ক্লান্তি/ এখনি কি, সখা, খেলা হল অবসান।।/ সে মধুর রসে ছিলে বিহ্বল সে কি মধুমাখা ভ্রান্তি-/ সে কি স্বপ্নের দান। সে কি সত্যের অপমান।' দ্বিধা নেই, দ্বন্দ্বাতীত, চলতি জগতের এ চিত্র প্রকৃতির বিরুদ্ধে, তাই সত্যের অপমান।

একই শাস্ত্র লক্ষ্য করলে, পুরাকালে পুরুষকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রকৃতি-বিবেক-কার্যকারণ সবই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। নারী গৌণ ছিল বা তাকে সমস্যায় টেনে এনে জর্জরিত করা হয় নি। শুধুই দেব-দ্বিজে ভক্তি নিয়ে, কুশল মঙ্গলের পথে চলে, নারীরা মৈথুন ক্রিয়ায় গুণবান পতি আর দেব শিশুর জন্মদান করত। শ্রীশ্রী গীতায় যে পুরুষ বর্ণিত আছে, তা এরকম, 'পুরুষ ঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।' অর্থাৎ পুরুষ, প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হয়ে প্রকৃতির গুণসমূহ ভোগ করেন। এখানে যে পুরুষের উল্লেখ আছে, তাঁর নারীর প্রণয় আছে, কোন কামজ ভাব তাতে নেই। এ পুরুষ নারীকে উদ্বুদ্ধ করেন, তৃপ্ত করেন, সবটাই নারীর ইচ্ছায় হয়, তাই 'বিকারগ্রস্ত' প্রণয়ের কোন স্থান এখানে নেই। এখানটায় নারী-পুরুষের প্রকৃতিসুলভ প্রণয় আছে। অর্থলোলুপতা বা টাকা মাগার এ যে চলতি জগৎ যা বাঁচা-বাড়াকে ফাঁকা করে দিচ্ছে, তা ঐ প্রাচীনকালে সম্ভবই ছিল না। 'নারী মাগে টাকা' — এ দিন বদলে ধীরে ধীরে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির দাপটে আজকে এ দেশেও 'ফ্যাশন' হিসেবে চলছে। ভোগ-বাসনার এ দাপট লক্ষ্য করার মতো। এ নিয়ে কোন দ্বিধা নেই।

এ আলোচনার বিষয়কে নিয়ে বিশ্লেষণে একটি কথা মনে রাখতে হবে, নারী-পুরুষের মূলতঃ যে কাছে আসা, তা সংসার জীবন যাপন আর বিবাহেই সম্ভব, ওটা বেশি মাত্রায় ওখানটায় দেখা যায়। তাছাড়াও কর্মক্ষেত্র, ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও নারী-পুরুষ সহাবস্থান করে কার্য সম্পাদন করে। তাই সংসার আর সম্পর্ক আলোচনায় মূলত বিবাহ প্রসঙ্গ আসে। 'সুবিবাহ' এ প্রসঙ্গে অতি প্রয়োজনীয় একটা ঘটনা। বর্তমান সময়ে বিবাহের যে অবনমন আমরা ঘটাচ্ছি, পশুপাখিও ওটা দেখলে লজ্জা পাবে। তবে কেন? এর ব্যাখ্যায় বিবাহে বিচার্য কয়েকটি বিষয় আলোচনা করতে হয়। বিবাহের মূল উদ্দেশ্য কি? উত্তর 'উন্নয়ন' আর 'সুপ্রজনন'। এ বাস্তবায়ন করতে গেলে— বিয়ে খাওয়ায় মিলের ব্যাপার, কম্পাটিবিলিটি টেস্ট (সঙ্গতিশীলতা) ইত্যাদির বিশেষ প্রয়োজন হয়ে গেছে। আধুনিক সমাজে এখনো লাভ ম্যারেজ ব্যতীত অন্যক্ষেত্রে অভিভাবকরা সঙ্গতিশীলতার পরীক্ষা অবশ্যই করেন। এ ধরনের পরীক্ষা আলোচনা, ক্রমঃ ক্রমঃ দেখাশুনা, আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাফল্য লাভ করে। ওখানটায় 'শ্রেষ্ঠবরে আনতি' সঙ্গত কারণেই নারীদের ক্ষেত্রে সুনিশ্চিত হয়। প্রাচীনকালের বর্ণাশ্রম হুবহু না মানা হলেও, তাতে বাহিত ও রক্ষিত হয়। তর্কের খাতিরে কেউ যদি বলেন, নারীদের বরে শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার প্রয়োজন নেই তা সত্যের অপলাপ হবে। প্রকৃতির সৃষ্টিই এটা 'ডিমান্ড' (চাহিদা) করে। 'অ্যাডমাইরেশন ফর সুপিরিয়র' (শ্রেয়র কবি শ্রদ্ধা) আর তা যদি ইচ্ছাশক্তি, নিষ্ঠা, সহানুভূতি, সতর্ক জিজ্ঞাসা, বুদ্ধি দ্বারা চর্চিত হয়, সেখানে 'বায়োলজিক্যাল সুপিরিয়রিটি' (জৈব উৎকর্ষ) সাধিত হয়। 'নারী মাগে টাকা'— ওটা এ জায়গায় মিথ্যে হবে। ওখানে নারী শ্রদ্ধাপূর্ণ, সেবাপূর্ণ চাহিদায় পুরুষে অনুগত, উপগত বা আরো সহজ কথায় 'মিলিত' হয়। এরকম মানসিক মিলনের আকুতিকে 'সুরত' বলা হয়। অন্তর্নিহিত আকুতি বা লিবিডো (সুরত) যতটাই বিন্যস্ত, 'বিকাশপ্রাপ্ত মানুষ' ততটাই উন্নত এবং সুপ্রজননজাত। এ ধারণাই দেবশিশুর জন্ম দেয়। এ যে নারীর 'দেবশিশু' জন্ম দেওয়াটা, প্রত্যেকটি নারীর এ যেন একান্ত মনের ইচ্ছা। এ সুপ্ত বাসনা যে নারীর নেই, সে 'মা' হওয়ার আগে আরো একটু ভেবে নেওয়া প্রয়োজন। নারী যখনই 'সুপ্রজনন' চিন্তায় লিপ্ত থাকবেন, ক্রমান্বয়ে এর স্টেপগুলি নারীর জীবনে চলে আসবেই। এ প্রসঙ্গে সঠিক বিবাহের শর্তগুলি সম্পর্কে সদ্‌গুরুর ধারণা নেওয়া যায়। সদ্‌গুরু বললেন, 'স্বামী ও স্ত্রী সমবিপরীত সত্তা হওয়া চাই— উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত সামঞ্জস্য চাই। পুরুষ বংশ, বিদ্যা, চরিত্র, যোগ্যতা, নিষ্ঠা, বয়স ইত্যাদি দিক দিয়ে নারীর থেকে উন্নত হওয়া বাঞ্ছনীয়। মেয়ের মধ্যে ঐ পুরুষকে বরণ করার নেশা থাকা চাই। এমনতর শ্রদ্ধা থাকা চাই, যাতে সে মনে করে তাকে পেলে তার জীবন ধন্য হয়ে যাবে। আগে ঘটকরা সব দিক মিল করে বিয়ে দিত। তখন মানুষের অভাব হত না। বংশ পরম্পরায় মানুষ পাওয়া যেত।' এখনো যে বিয়েতে, যে দাম্পত্য প্রেমে, সঙ্গমে, ভালোবাসায়, 'প্রকৃত মানুষ' এর জন্ম হয়, তা আলোচনাবিহীন থাকতেই পারে। কিন্তু যেখানে

সমাজ জর্জরিত, শান্তি বিঘ্নিত— এ সমাজে হয়তো বা পুরুষ কামজ, কামবাসনায় নারীর প্রণয় চায়, নারীর কামনা-বাসনা অর্থলোলুপতায় বিদ্ধ হয়, সমাজ দূষিত হয়, বিবাহের মূলে যে উন্নত বংশ পরম্পরা তা বিঘ্নিত হয়। তাই বৈশিষ্ট্যকে নষ্ট করে বিরুদ্ধ মিলন নয়। চাই শ্রদ্ধার মিলন। আমাদের দেশের কর্ণধার, অভিভাবকদের আবারো নতুনভাবে ভাবতে হবে, আর যদি মনে হয়, 'ঠিকই আছে'— তাহলে তাকে চলতে দেওয়া উচিত। বিতর্ক তৈরি করা এ আলোচনার কোন উদ্দেশ্য নয়। যেহেতু আমাদের সমাজ একটা সুন্দর ব্যবস্থা থেকে সরে গিয়ে একটু একটু করে বিধ্বস্তির পথে চলছে, তা-ই এ চিন্তাভাবনার পুনঃ আলোচনা বা নতুন সমীকরণ গড়ার এ এক ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা মাত্র।

রবীন্দ্রনাথ মনে মনে বেদান্তের দর্শন চিন্তা করতেন, তাই লিখলেন, 'হে মাধবী, দ্বিধা কেন, আসিবে কি ফিরিবে কি—/ আঙিনাতে বাহিরিতে মন কেন গেল ঠেকি।।/ বাতাসে লুকায়ে থেকে কে যে তোরে গেছে ডেকে,/ পাতায় পাতায় তোরে পত্র সে যে গেছে লেখি।।' বসন্তের আগমনে কবি প্রকৃতির আনন্দ লুটছেন। এ যে প্রকৃতি, এরই থেকে 'প্রকৃত' তৈরি হয়। এর ব্যতিরেকে সব 'মিথ্যা।'

বেদান্তের দর্শনে আজকের যুগে আমাদের আলোকিত হওয়া প্রয়োজন। অভিভাবকরা আজ দিশেহারা। নতুন একটা সংস্কৃতি, বিশ্ববিদ্যালয় যুবসমাজকে বিধ্বস্তির পথে নিয়ে যাচ্ছে। মোবাইল সংস্কৃতি, মোবাইল বিশ্ববিদ্যালয়। ওটা ছাড়াও হবে না। তাই পাশাপাশি বেদান্ত শিক্ষা, নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজন। কঠ উপনিষদের একটি শ্লোক এখানে উল্লেখ করা যায়।

"শ্বোভাবা মর্তস্য যদন্তকৈতৎ সর্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ।।

অপি সর্বজীবিতমল্পমেব তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে।।

(১ম অধ্যায়/ ২৬ নং)

এখানে নচিকেতার সঙ্গে যমরাজের কথা হচ্ছে। নচিকেতা বললেন, 'হে যমরাজ, যে সকল ভোগ্যবস্তু আপনি আমাকে দিতে চান, সে সমস্তই ক্ষণস্থায়ী— আজ আছে, কাল থাকিবে কি সন্দেহ। ইহারা মানুষের সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তি ক্ষয় করে। আর আপনি যে দীর্ঘজীবন আমাকে দিতে চান, তা অনন্তকালের তুলনায় নিতান্তই অল্প। অতএব এই রথ, অশ্ব প্রভৃতি বাহন, নৃত্যগীত সমস্ত আপনারই থাকুক, আমি এদের কিছুই চাই না।'

নচিকেতা বললেন, "বরস্তু মে বরণীয়ঃ স এব।"

অর্থাৎ, "আত্মার তত্ত্ববিষয়ক বরই আমার প্রার্থনীয়"। এ যে সম্পূর্ণই অপার্থিব, লোভশূন্য এক চাহিদা। ষড়রিপুতাড়িত তো নয়ই, বরং প্রকৃতিজাত মানসিক অবস্থা। এ থেকেই সুস্থ পরম্পরা তৈরি হতে পারে। বেদান্ত দর্শনের ওটাই মূল আলোচ্য বিষয়।

এ আলোচনার বিষয়ানুসন্ধানে 'সুবিবাহ' কাম্য বলেই সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। বিভিন্ন মতামত থাকতেই পারে, কিন্তু এটা ধ্রুব সত্য, 'নারী হতে জন্মে জাতি' এবং তাই 'নারী' এতটা গৌরবময়। তাঁকে 'মা' বলে আমরা বিচার করি। সুবিবাহ আর সুপ্রজনন যদি এতটাই সস্তা হয়ে যেত, 'মনুসংহিতা' বলে এত বড় শাস্ত্রগ্রন্থ রচিত হত না। আর আমরা তো মানুষের ক্ষেত্রে এ ভেঙে সব ঠিক রাখতে পারছি না। যদি সম্ভব হত, 'আধুনিক ভাষা' বলে গ্রহণ করা যেত। সুস্থ-সবল-ভালো মানুষের অভাব সবাইকে বিব্রত করছে। কৃষিক্ষেত্রে ধান-গমের উন্নত ফলনের চিন্তাভাবনা সফল হচ্ছে অন্ততঃ পরিমাণের নিরিখে, আবার পশু-পাখির ক্ষেত্রেও আমরা সফলতা পাচ্ছি। পূর্ণিমার চাঁদ নিস্তব্ধ এবং এর জ্যোৎস্নায় বন্যপশু চিতাবাঘের সঙ্গম ঘটে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। নিশ্চয়ই সুফল আছে বা প্রকৃতিই ওটা নিয়ন্ত্রণ করে। আবার পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় 'একটি পাতা, দু'-টি কুঁড়ি'র চা তোলা হয়। একে অন্যতম দামি চা 'ফুল মুন টি' বলা হয়। গবেষণা চলছে। আর মানুষের ক্ষেত্রে 'সন্তান উৎপাদন'-এ কোন বাধা, কোন নিয়ম থাকবে না— এ কি করে হয়? একটু ভাবা প্রয়োজন। ধীরে ধীরে আমাদের ঐতিহ্য-রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীশ্রী গীতা, বেদ, বেদান্ত জ্ঞান সীমিত থেকে আরো সীমিত হয়ে যাচ্ছে। ফলে অনাচার, যথেচ্ছাচার, বিজ্ঞানুভূতির নাম নিয়ে সমাজকে গ্রাস করছে। এর থেকে উত্তরণের পথ সর্বশ্রেষ্ঠ জীব মানুষকেই বের করতে হবে। মানুষ বের করতে পারছে না, তাই সমাজকর্তারা বলছেন, " ২২ থেকে ৩০ এর মধ্যে মা হওয়া উচিত। ভগবানই এমনভাবে দেহ গঠন করে দিয়েছেন। তাই যাঁদের বিয়ে হয়নি, জলদি বিয়ে করে সেরে নেবেন।" এটা একটা উক্তি নয়,এটা আমাদের জীবনকে চালনা করার কৌশল, একজন অভিভাবকের গার্হস্থ্য জীবনের শেষদিকের দুর্ভাবনা। এ তো গেল বিয়ে বা এ সংক্রান্ত বিষয়। বিয়ের পর সামাজিক ঝামেলা নিয়েও সমাজকর্তাদের শুনতে হচ্ছে, 'সংসার জুড়ে দিন, আমার বৌমাকে বাড়িতে ফিরিয়ে দিন।' এ লেখার শিরোনামটা সম্পূর্ণ হলে যা দাঁড়ায়, তা এরকম, 'পুরুষ মাগে নারীর প্রণয়/ নারী মাগে টাকা/ এমনি করে চলতি জগৎ/ বাঁচাবাড়ায় ফাঁকা।' এক জটিল পরিস্থিতিতে সমাজ আবর্তিত। রবীন্দ্রনাথ ঐ জায়গায় পরিত্রাতা, শেষ হল তাঁর কথায়, 'বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা—/বিপদে আমি না যেন করি ভয়।'

মহাজাগতিক সৃষ্টিতত্ত্বের রহস্য !
নিয়ামক কি ভগবান শ্রীকৃষ্ণই ?

— সুব্রত সাহা

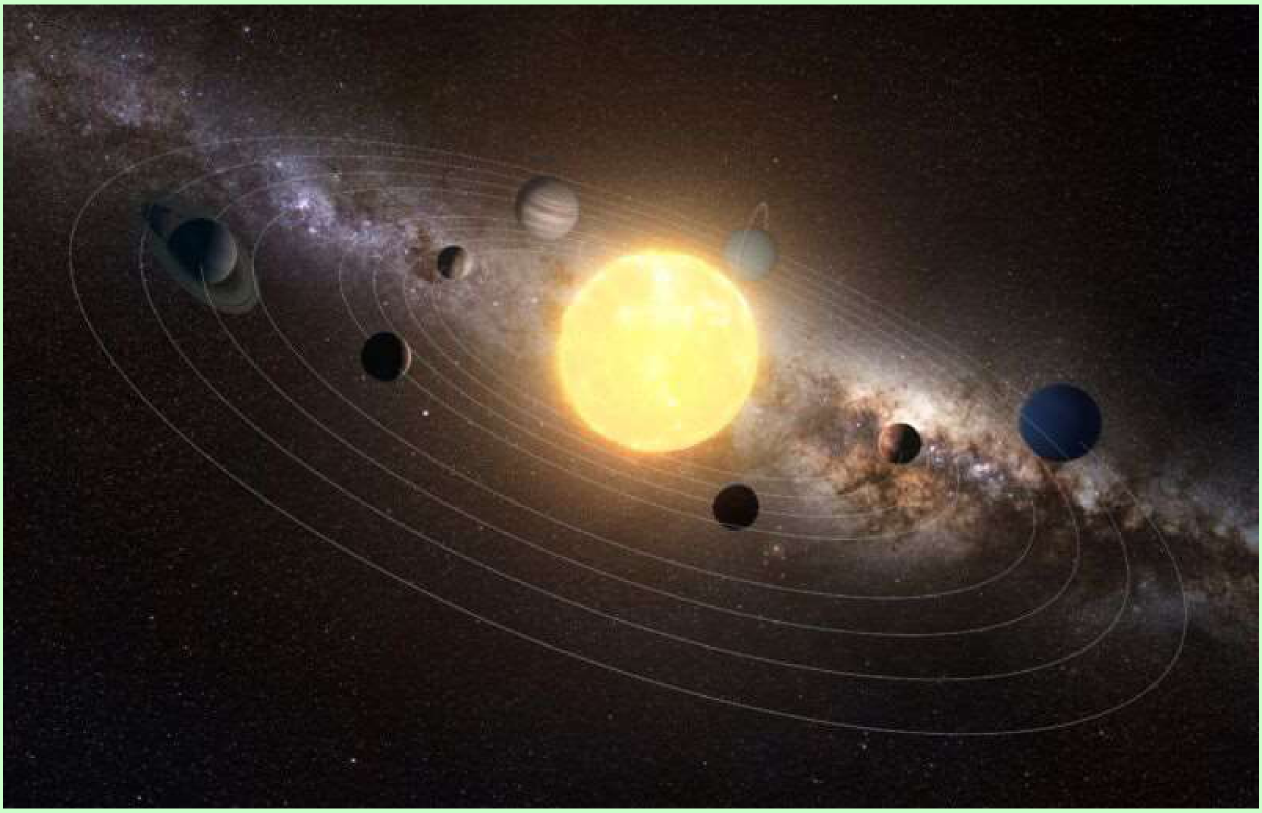

মহাবিশ্ব কোথা থেকে এল ? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রহস্যই বা কি ? সৃষ্টিতত্ত্বের আসল ব্যাপারটাই বা কি ? এই মহাবিশ্বের রহস্য সন্ধান নিয়ে পৃথিবীর খ্যাতনামা বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন, তবে এর মধ্যে অধিকাংশ বিজ্ঞানীই মহাজাগতিক মহাবিস্ফোরণকে বিশ্বসৃষ্টির কারণ বলেছেন। এ বিষয়ে তারা তিনটি তত্ত্বের অবতারণা করেছেন। তিনটি তত্ত্বের মধ্যে 'মহাবিস্ফোরণই' বিশ্ব সৃষ্টির অন্যতম কারণ বলে বিজ্ঞানীরা জোর দিয়ে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বই সবচেয়ে বেশি সমাদৃত ও সরল। কি আছে এই তত্ত্বে ? বিশ্বসৃষ্টির অন্যতম কারণ ও ব্যাখ্যা রয়েছে এই থিওরি বা তত্ত্বে। একটু পর্যালোচনা করা যাক।

According to the Big Beng Theory. The Universe had its origin in a great explosion about 18,000 millions years ago. The matter flung out from the explosion condensed into lumps called galaxies which are still rushing outwards. As the universe grows old, the matter in it thins out.

উপরিউক্ত তত্ত্ব থেকে এটা পরিষ্কার যে কোন এক মহাজাগতিক বিস্ফোরণ থেকেই এই মহাবিশ্বের উৎপত্তি হয়েছে এবং এই বিক্ষিপ্ত টুকরো টুকরো অংশগুলি অর্থাৎ বিস্ফোরিত খণ্ড বিখণ্ডগুলি সংক্ষিপ্ত আকারে পিণ্ডের ন্যায় ঘুরে বেড়াচ্ছে যাকে ছায়াপথ বলা হয়ে থাকে, যেগুলি দ্রুতগতিতে ছুটছে। যেহেতু মহাবিশ্ব প্রায় ১৮,০০০ লক্ষ বছর পুরোনো তাই ব্যাপারখানি বিরল দৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। তবু রহস্য তো থেকেই যাচ্ছে। আমেরিকা ও ইউরোপীয় সার্ণ বিজ্ঞানীরা এই রহস্য সন্ধানে দিনরাত এক করে ভূগর্ভের নীচে শত মাইল গবেষণা করে লক্ষ কোটি টাকা খরচ করেও এখনও এর সঠিক সন্ধান পাচ্ছেন না। অনেকদিনের গবেষণা শেষে তারা ব্যর্থ হয়ে অবশেষে 'গর্ডস পার্কেল' বা 'ঈশ্বর কণা' নামে এক শক্তিধর ব্যাপার আছে বলে আপাতত অনুসন্ধান বন্ধ রেখেছেন মহাবিশ্বের এই রহস্য উদ্‌ঘাটনকে।

পাশাপাশি আইনস্টাইন ও নিউটনের মতো বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানীগণও সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, ভগবানের অস্তিত্ব ব্যতীত বিশ্বজগতের অপূর্ব শৃঙ্খলার ব্যাখ্যাদান অসম্ভব। নিউটনের প্রশ্ন হল যদি মহাবিস্ফোরণই এই বিশ্বসৃষ্টির কারণ হয় তাহলে সর্বত্র একই চরিত্রের পদার্থের সমাবেশ না হয়ে প্রজ্জ্বলন্ত মহাদ্যুতিমান সূর্যের বা স্নিগ্ধদ্যুতি পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহ কিভাবে সৃষ্টি হল? প্রচণ্ড গতিবেগ নিয়ে ঘূর্ণায়মান মহাজাগতিক নক্ষত্র ও গ্রহসমূহের সুনির্দিষ্ট পথের ও গতির নিয়ামক কে? স্রষ্টা ব্যতীত কিভাবে সম্ভব এই অপূর্ব সুশৃঙ্খল সৃষ্টির? মহাপ্রলয়েও ধ্বংস হয় না সুশৃঙ্খল এই সৃষ্টি, অদ্ভুত! মায়াবী এই ব্রহ্মাণ্ড।

বিজ্ঞানীদের অধিকাংশই আস্তিক। কিন্তু জড় বিজ্ঞানের শিক্ষায় ও ভ্রান্ত মোহ ও অহঙ্কারের বশে তারা বিশ্বজগতের নিয়ন্তা এক শাশ্বত সর্বব্যাপী শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করে। কিন্তু পরক্ষণেই স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হয় সর্বকারণের কারণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ পরমেশ্বর ভগবানককে। বিতর্কের সৃষ্টি এখান থেকেই। কে বড়? বিজ্ঞান না ভগবান? শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা সাষ্টাঙ্গে অবদমিত হয়ে প্রণাম জানিয়ে 'ঈশ্বর কণা' বা 'গডস্ পার্কেল' বলে রহস্যের সন্ধানে থমকে দাঁড়ায়। আর এগোতে সাহস পায় না। চন্দ্রাভিযান বা সূর্যের রহস্য যাই বলুন না কেন, মহাবিশ্বের রহস্য সন্ধানে আজও রহস্যই হয়ে রইল। কোথা থেকে এল এই গ্রহ-নক্ষত্র। বিশ্বব্রহ্মান্ডের সৃষ্টিতত্ত্ব যা সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে চলছে লক্ষ বছর ধরে, এই রহস্যের সন্ধান মিলবে কি?

প্রকৃতপক্ষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হলেন সেই নিয়ামক যিনি নিজেকে এই জগতের স্রষ্টা ও বিনাশকারী বলে প্রকাশ করেছেন। গীতার ১০/৮ শ্লোকে ভগবান বলেছেন— 'অহং সর্বসৎ প্রভবো মত্ত: সর্বং প্রবর্ততে'— 'আমিই সমস্ত জগতের উৎপত্তিস্থল— আমা হইতেই সব প্রবর্তিত হয়।'

তাঁর সাথে জড়জগতের সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করেছেন, সেই নিয়ন্তাই হচ্ছেন সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ— চিদবস্তু ও জড়বস্তু তাঁরই শক্তির প্রকাশ।

গীতার শ্লোক ৯/৭— 'সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম।

কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম।'

অর্থাৎ হে কৌন্তেয় প্রলয়কালে সকল ভূত আমার ত্রিগুণাত্মিকা মায়াতে লীন হয়। আবার সৃষ্টিকালে আমিই তাদের সৃজন করি। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শনের সময় অর্জুন অর্থাৎ কৌন্তেয় যা দেখতে পেয়েছিলেন। অতঃপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখ থেকে নিঃসৃত বাণী সবার হৃদয়ে গেঁছে রয়েছে— যা সত্য ও শাশ্বত।

শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বচরাচরের আত্মা। তিনি বলেছেন—

'অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ' (গীতা শ্লোক ১০/২০)

'এ বিশ্ব চরাচরের আমি আদি সত্তা, মধ্যে পালনকর্তা ও অন্তে সমস্ত শক্তিপুঞ্জের সংহার কর্তা। নিজেকে তিনি প্রকাশিত করেন তিন পুরুষাবতারে। প্রথম পুরুষাবতার— চিৎজগৎ বৈকুণ্ঠলোক ও জড়জগতের সীমারেখা মহাজাগতিক কারণ সমুদ্রে শায়িত মহাবিষ্ণু। তিনি জড় ব্রহ্মান্ডের মূল উপাদান মহৎতত্ত্বের আত্মা। তাঁর থেকেই সমস্ত জড় ব্রহ্মান্ড সমূহ প্রকাশিত হয়। মহৎ তত্ত্বেই প্রকৃতির সারভূত উপাদান ত্রিগুণ (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ) নিহিত।

শিব অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন 'মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মি, গর্ভং দধাম্যহম। সম্ভব) সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত।'

হে ভারত মহৎ নামক প্রসিদ্ধ ব্রহ্ম আমার ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি। ইহাই সর্বভূতের উৎপত্তির কারণ। সুতরাং মহাবিস্ফোরণ নয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রথম পুরুষাবতার কারনা নিবসায়ী মহাবিষ্ণুই সমস্ত বিশ্বসৃষ্টি তত্ত্বের আদি ও মূল কারণ। যা আইনস্টাইন ও নিউটনের মত বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানীরা অকপটেই স্বীকার করে গেছেন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার--- শ্রীশ্রী গীতা ও শরণাগতির শুভসংকল্প ড. মিলন চন্দ্র পাল, উদয়পুর।

DISASTERS & OUR THOUGHTS

- Santonu Saha

We all know that Disaster is a calamity of sudden happening. A disaster causing jury & death to a large number of people during a short span of time and the disaster management has undergone a paradigm shift in recent years from the earlier approach of response to disasters to the current holistic approach of disaster mitigation and preparedness. Among other natural calamities to which the TRIPURA State is most vulnerable is earthquake. As per the seismic zoning map of india, Tripura falls in Zone-V which is the most severe seismic zone.

So first we have to think that we can protect the new generation & valuable wealth of our state and country from this destruction & for that we have to learn & experience from different events in the world.

The objectives of disaster management plan should be to localize a disaster and to the maximum extent possible contain and minimize the impact of life, environment and property. A formal plan for managing disasters is therefore necessary.

The State Disaster Management plan (SDMP) of Tripura has prepared as per the disaster management act, 2005 and guidelines of Nation Disaster Management Authority. The SDMP has also consulted with all responsible line departments & relevant agencies with in and outside the state. Finally, the plan has been approved by Tripúra Disaster Management Authority on recommendation of the state Exécutive Committee and later some amendments were added to it.

The State is prone to severe earthquakes, In addition, the state is also affected by disaster like floods, epidemics, fire, cyclone, hailstorm, lighting, road accidents etc. We know that if there is no danger, we will not move so those departments and organizations that come first in dealing with any disaster and calamities should be prioritized and improved by the Government.

My Practical experience says that to deal with any man made or natural calamities Tripura Fire & Emergency Services Dept. TSR' Forces & Police personnel jump in first then NDRF team comes forward to help in rescue operations. Specially the personnel who belongs to Tripura Fire And Emergency Services Dept. through their special training with their limited resources, they are the first responder who risk their lives to save lives & property from any unexpected event now a days.

However as per the instruction of Govt. of India, the state disaster management authority has been constituted in the year 2004, Then after enactment of DM act 2005, the SDMA notification was modified to constitute Tripura disaster management authority during 2008 under the chairmanship of Hon'ble Chief Minister, Tripura. The TDMA has two distinct objects like (a)Development and updating of plans & strategies to handle any type of disaster at various levels through intensive preparedness, prevention and mitigation and (b) Undertake post disaster activities on restoration and strengthening of infrastructures damaged by disasters.

At present various Dept. like SIPARD, CTI, PRTI, PTA, Fire Training School, Civil Defense, NIT, NDRF, SDRF, NGO, AGMC & TMC, etc. have taken initiative to train the personnel of

various departments through disaster management training to deal with any kind of disaster in Tripura.

Different Officials from the state up to the village levels have been trained on disaster management subject both in general and specialized topics in different training institutions.

Currently, various awareness programs are organized to mitigate the darnaged caused by various natural disasters and make the 3 public aware of what to do in post-disaster situations through Mock drill. Every year mega Mock drill is organized by Tripura Disaster Management Authority & Revenue Dept. with other Dept. Govt. of Tripura.

Special emphasis is placed on this issue in schools so that the very young children students are protected from any incident.

But we all have to remember that this is a continuous effort and the Govt. should take important steps to improve the sensitive issue in line with other countries.

Lastly the ultimate vision is to have a disaster resilient Tripura with total risk reduction as the main monitoring parameter in all development investments and initiatives to ensure sustainable development.

A Penniless Billionaire

- Gourav Datta

Prejudiced from birth,
With foods just enough,
And yet, he was happy.

On the roads, pulling a cart,
With his torn blue shirt,
And yet, he was happy.

His wings, hard he flapped,
But he was a love handicap,
And yet, he was happy.

He fed, each and every stray,
With not a piece on his tray,
And yet, he was happy.

He had a salt n pepper beard,
His arms grew old and tired.
And yet, he was happy.

Sat on a corner, with his soul,
Asking for happiness in his bowl,
And yet, he was happy.

He saved a zilch to a were,
And had 8 canines as heirs.
And yet he was happy.

Donated all that he kept,
And just silently, he left,
Gifting the World ‘His Happy’.

চলার পথে ক্লাব হারিয়েছে যাঁদের

উপদেষ্টামন্ডলীর প্রয়াত সদস্যরা

মিহির চক্রবর্তী

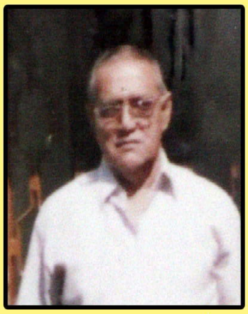
সাধন চক্রবর্তী

মাখন কর

রাখাল দাশগুপ্ত

প্রবোধ কুমার দেব

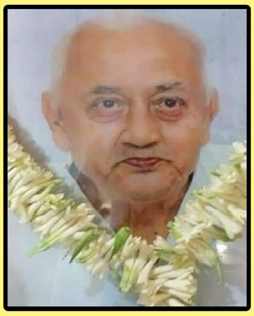
মুকুল চক্রবর্তী

লক্ষণ ধর

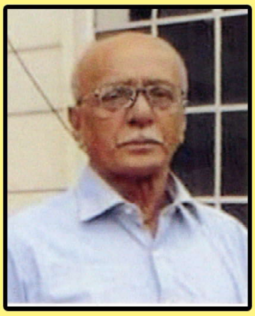
শংকর দত্ত

শেফাল দাশগুপ্ত

শশধর সেন

প্রয়াত ক্লাব সদস্যরা

চন্দন চক্রবর্তী

দিলীপ দে

ভুলন বণিক

হারু দাশগুপ্ত

অজিত দে

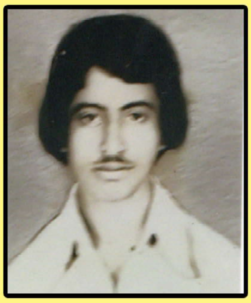
গৌতম ধর

স্বপন বণিক

ফুলন বণিক

স্বপন দেবরায়

প্রদীপ দেব

২০২৩ সালে 'প্রতিবিম্ব' শারদ সংখ্যা প্রকাশ করছেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা

২০২৩ সালে ক্লাবের দুর্গা পূজা মন্ডপে এলাকার মহিলাদের সাথে মুখ্যমন্ত্রী

২০২৩ সালে আগরতলা শহরের অন্যতম পূজো আয়োজনের শিরোপা হাতে ক্লাব সদস্যরা

ক্লাব সংলগ্ন পুকুর সংস্কার ও সৌন্দর্যায়ণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পর মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা, ক্লাব সভাপতি সজল চক্রবর্ত্তী ও মেয়র দীপক মজুমদার। এই পুকুর সংস্কারের কাজ বর্তমানে প্রায় সম্পন্ন।

হীরক জয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ক্লাব প্রাঙ্গণে চলছে আলপনা আঁকার কাজ।

হীরক বর্ষ উদ্‌যাপন নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে ক্লাবের কর্মকর্তারা

২০১৪-১৫ সালে ক্লাবের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপনের নানা রঙিন মুহূর্ত

সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করছেন ক্লাবের উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান মিহির চক্রবর্তী। রয়েছেন তৎকালীন বিধায়ক আশিস সাহা, কাউন্সিলার শুভ্রা দে, কনভেনার সঞ্জু দত্ত, ক্লাব সভাপতি সজল চক্রবর্তী ও প্রাক্তন সম্পাদক অলক দে।

সুবর্ণ জয়ন্তীর অনুষ্ঠানে রামকৃষ্ণ নাটকের একটি দৃশ্য

সুবর্ণ জয়ন্তীর মঞ্চে নৃত্যানুষ্ঠান

বক্তব্য রাখছেন তৎকালীন সাংস্কৃতিক সম্পাদক চন্দন চক্রবর্তী (প্রয়াত)

অনুষ্ঠান মঞ্চে ক্লাব সভাপতি সজল চক্রবর্তী ও তৎকালীন সম্পাদক বিদ্যুৎ সেন

এলাকার প্রবীণা গীতা রাণী দত্তকে মঞ্চে সংবর্ধনা

অনুষ্ঠানে প্রাক্তন সম্পাদক সজল চক্রবর্তী (বড়) কে সম্বর্ধনা প্রদান করছেন প্রাক্তন সভাপতি আশিস রায়

ক্লাবগৃহে কর্মকর্তাদের সাথে স্বামী হিতাকামানন্দ মহারাজ

Azadi Ka Amrit Mahotsav

सत्यमेव जयते

রাজ্যের সকল ভোক্তাদের প্রতি

ত্রিপুরা সরকারের আবেদন-

- যে কোন কেনাকাটায় রসিদ নিন। রসিদে দ্রব্যের নাম/পরিষেবার বিবরণ ও তারিখ থাকা দরকার। গ্যারান্টি/ওয়ারান্টি থাকলে সেটাও বুঝে নিন।
- রেশন সামগ্রী নেওয়ার সময় e-POS মেশিনে মুদ্রিত রসিদ চেয়ে নিন এবং রসিদে উল্লেখিত দ্রব্যাদি আপনি পেয়েছেন কিনা তা যাচাই করে নিন।
- ভুয়ো এবং প্রতারণামুলক বিজ্ঞাপনের ফাঁদে পা দেবেন না।
- মেয়াদকাল উত্তীর্ণ কোন জিনিস কিনবেন না।
- অপরিচিত কোন ব্যক্তির কাছ থেকে আপনার টেলিফোনে আসা অর্থপ্রাপ্তি সংক্রান্ত কোনো বার্তা বা লোভনীয় প্রস্তাবে সাড়া দেবেন না।
- আপনার এ.টি.এম কার্ডের নম্বর, মেয়াদের তারিখ ও সি.ভি.ভি নম্বর কাউকে জানাবেন না।
- ক্রেতা হিসাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বলে মনে করলে উপযুক্ত ভোক্তা কমিশনে বা ন্যাশনাল কনজিউমার হেল্প লাইনে অভিযোগ দায়ের করে প্রতিকার আদায় করে নিন। ভোক্তা কমিশনে আপনি অনলাইনেও অভিযোগ জানাতে পারেন।

সচেতন হউন: সুরক্ষিত থাকুন

ন্যাশনাল কনজিউমার হেল্প লাইন	ই-ফাইলিং পোর্টাল
১৯১৫	www.edaakhil.nic.in

জাগো গ্রাহক জাগো

ত্রিপুরা সরকারের খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের পক্ষ থেকে জনস্বার্থে প্রচারিত